কপালকুণ্ডলা

[১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত অষ্টম সংস্করণ হইতে]

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য এক টাকা চার আনা

আষাঢ় ১৩৪৫

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্তৃক
মুদ্রিত

বিজ্ঞপ্তি

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, রবিবার, (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৭এ জুন) রাত্রি ৯টায় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন—ঐ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল—দেববালারা অলক্ষ্যে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল—স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী। এই শতবার্ষিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নানা উদ্‌যোগ-আয়োজন করিতেছেন—দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইতেছে। সারা বাংলা দেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে।

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় রচনার একটি প্রামাণিক 'শতবার্ষিক সংস্করণ'-প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা—বাংলা ইংরেজী, গদ্য পদ্য, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নির্ভুল ও Scholarly সংস্করণ প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম—১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে—করা হইতেছে; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে এই সুমহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে আমি গৌরব বোধ করিতেছি।

পরিষদের এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের ভূম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর। তাঁহার বরণীয় বদান্যতায় বঙ্কিমের রচনা প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উদ্যমও উল্লেখযোগ্য।

শতবার্ষিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের উপর। বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীর্তি পুনরুদ্ধারের কার্যে তাঁহারা ইতিমধ্যেই যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনেও তাঁহাদের প্রভূত নিষ্ঠা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। তাঁহারা বহু

অসুবিধার মধ্যে এই বিরাট্ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি।

যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদকদ্বয়কে বঙ্কিমের সাহিত্য-সৃষ্টি ও জীবনীর উপকরণ দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। আমি এই সুযোগে সমবেতভাবে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়া ও স্বতন্ত্র ভূমিকা দিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্কিমের যে সকল ইংরেজী-বাংলা রচনা আজিও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং বঙ্কিমের চিঠিপত্রাদি—এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। সর্বশেষ খণ্ডে মল্লিখিত সাধারণ ভূমিকা, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার লিখিত বঙ্কিমের সাহিত্যপ্রতিভা বিষয়ক ভূমিকা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত বঙ্কিমের গ্রন্থপঞ্জী ও রাজকার্যের ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস সঙ্কলিত বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বঙ্কিম সম্পর্কে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা থাকিবে। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এই খণ্ডে বিভিন্ন ভাষায় বঙ্কিমের গ্রন্থাদির অনুবাদ সম্বন্ধে বিবৃতি দিবেন।

বিজ্ঞপ্তি এই পর্যন্ত। বঙ্কিমের স্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট চিরোজ্জ্বল থাকুক।

১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫
কলিকাতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ভূমিকা

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তাঁহার বয়স তখন মাত্র সাতাইশ বৎসর। এই পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক্ হইতে অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হইতে থাকে। সকল সমালোচনার মধ্যে এই কথাটা সুস্পষ্ট হয় যে, বাংলা সাহিত্যে অভাবনীয়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ঐ উপন্যাস এবং তাহার লেখককে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বাংলা ভাষায় লিখিত উপন্যাস পাঠে যে তদানীন্তন ইংরেজী শিক্ষিত, মনে প্রাণে ইংরেজীভাবাপন্ন সম্প্রদায়ও অভিভূত হইতে পারেন, 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের ফলে এই সত্যটাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা পরিত্যক্ত ও ইয়ং বেঙ্গল কর্তৃক ঘৃণিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া গদ্যসাহিত্যের—ঐ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ একটি যুগসন্ধিক্ষণ। উপকরণ সবই ছিল, উপকরণের যথাযথ প্রয়োগে যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্র বাণীমন্দিরে মাতৃভাষার এমন একটা মোহিনী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, নিতান্ত বিমুখ ও অত্যন্ত অলস ব্যক্তিকেও একবার কৌতুক ও কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিতে হইল। এক মুহূর্ত্তে বিপুল সম্ভাবনার সূচনা দেখা দিল। তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের পুরোধা 'রহস্য-সন্দর্ভ'-সম্পাদক মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিলেন—

> বাঙ্গালীতে যত গদ্যকাব্য হইয়াছে, তৎসকলই প্রায় বিদ্যাসুন্দরের ছায়াস্বরূপ বোধ হয়; এবং সেই বিদ্যাসুন্দরও সংস্কৃত চৌরপঞ্চাশতের অনুকরণ মাত্র। ফলে এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা আমাদিগের এক প্রাচীনা কুটুম্বিনীর সদৃশ বোধ হন। ঐ কুটুম্বিনীর নিকট আমরা বাল্যকালে "রূপকথা" শুনিতাম, এবং তিনি প্রত্যহ আমাদিগকে কহিতেন "এক রাজার দুই রাণী, সো আর দো, সোকে রাজা বড় ভাল বাসিতেন, দোকে দেখিতে পারিতেন না।" তিনি এক দিবসের নিমিত্তেও এই উপষ্টম্ভের অন্যথা করিতেন না, নবা গ্রন্থকারেরাও সেই রূপ আদর্শের অন্যথা করিতে বিমুখ। রত্নাবলীতে শ্রীহর্ষ নায়কের আদর্শ স্বরূপে বৎসরাজকে পৌরুষ-বিহীন অল্প-বুদ্ধি রোদনশীল কামাতুর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদবধি সেই ভাব নায়ক-মাত্রেতেই দৃষ্ট হয়, কুত্রাপি অন্যথা দেখা যায় না। এই প্রযুক্ত আমরা বঙ্গীয় সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইয়াও বাঙ্গালী গদ্যকাব্য-পাঠে অত্যন্ত অনুরাগবিহীন। পরন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করায় সে বিরাগের দূরীকরণ হইয়াছে।...ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা, সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে কাহাকেই চর্ব্বিতচর্ব্বণের ক্লেশ পাইতে হয় না। (২ পর্ব্ব, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৯-৪০)

ঐ কাম-কণ্টকিত নিষ্ফল গতানুগতিকতার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' যে আলোড়নের সৃষ্টি করিল, আজিকার দিনে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তখনও আপন প্রতিভা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হন নাই। 'কপালকুণ্ডলা' লিখিতে বসিয়া সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ হন; ফলে মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে তিনি যে গদ্যকাব্য রচনা করেন, সম্পূর্ণ পরিণত বয়সেও তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর বৎসরেক কাল অতিবাহিত হইতে না হইতে তিনি 'কপালকুণ্ডলা' মুদ্রিত করেন এবং এই পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবিসম্বাদিতরূপে বাংলা গদ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। 'কপালকুণ্ডলা' তৎকালীন সমালোচকদের এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী কালে বঙ্কিমের বহু শ্রেষ্ঠ উপন্যাস প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই 'কপালকুণ্ডলা'কেই বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম সংস্করণের মুদ্রণের তারিখ সংবৎ ১৯২৩ অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা কলিকাতার নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ইহা চারি খণ্ডে বত্রিশটি পরিচ্ছেদে ও ১২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র একটি পরিচ্ছেদ (৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, "গ্রন্থ খণ্ডারম্ভে") পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি ইহা একত্রিশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> গ্রন্থখানি দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিতা অবস্থায় যন্ত্রস্থ হয় নাই; প্রায় এক বৎসর যাবৎ ইহা গ্রন্থকারের নিকটে থাকিয়া সম্যক্ সংশোধিত হইতে পারিয়াছিল।··· শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, এই উপন্যাসখানি বাহির হওয়া মাত্র বঙ্কিম বাবুর যশোরাশি চতুর্দ্দিক বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং ইতি পূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই যশোজ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরের নেগুয়াঁ মহকুমায় বদলি হন; বর্ত্তমানে এই মহকুমা নাই, কাঁথি মহকুমা হইয়াছে। নেগুয়াঁ কাঁথির সন্নিকট এবং দরিয়াপুর ও চাঁদপুরের অনতিদূরে, সমুদ্রও ১৫।১৬ মাইলের বেশী দূরে নয়। বঙ্কিম-চন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, এই সময় এক জন সন্ন্যাসী কাপালিক মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত (বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ৭৩-৭৪)।

এই কাপালিক তাঁহাকে পরবর্ত্তী কালে 'কপালকুণ্ডলা'-রচনায় প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবে; সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ি, তৎসন্নিহিত অরণ্যপ্রকৃতির শোভা, রসুলপুর নদীর বিশালতা প্রভৃতির স্মৃতিও 'কপালকুণ্ডলা' পরিকল্পনার উপাদান জোগাইয়া থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াঁ হইতে খুলনায় বদলি হইবার কিছু দিন পরে দীনবন্ধু একবার তিন চার দিনের জন্য তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। পূর্ণবাবু লিখিয়াছেন, এই সময় বঙ্কিম তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যদি শিশুকাল হইতে কোনও স্ত্রীলোক ষোল বৎসর পর্য্যন্ত সমাজের বাহিরে সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কোনও কাপালিক কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় ও পরে বিবাহ হইলে সমাজ-সংসর্গে আসে, তাহা হইলে তাহার বন্যপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন সম্ভব কি না এবং পরবর্ত্তী কালেও কাপালিকের প্রভাব তাহার উপর থাকিবে কি না। দীনবন্ধু কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রহস্য করিয়া বলেন, যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয়, মেয়েটা চোর হইবে। পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলেন, কিছু কাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামিপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে। এই উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই। এই ঘটনার কয়েক বৎসরের মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়।*

'কপালকুণ্ডলা'র মতিবিবি-চরিত্রও নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের খুল্ল-পিতামহের মুখে শ্রুত কোনও গৃহস্থের কুলত্যাগিনী বধূর গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত হয়।† কাঁঠালপাড়া হইতে নৌকাযোগে হুগলী কলেজে যাইতে বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র এক দিবস কি ভাবে নিবিড় কুয়াশার মধ্যে পড়িয়াছিলেন, কি ভাবে মাঝিদের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল, "বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা"-শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ণচন্দ্র তাহারও উল্লেখ করিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র গল্পারম্ভে কুজ্‌ঝটিকার সহিত ইহার সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন।‡

'কপালকুণ্ডলা'-রচনার প্রেরণা ও ইতিহাস সম্পর্কে ইহার অধিক আর কিছু জানিবার উপায় নাই।

'কপালকুণ্ডলা'-সম্পর্কে বহু রসিক ও সমালোচক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বক্তৃতা ও ইতিহাসে 'কপালকুণ্ডলা' নানা ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব' (ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত) ও 'কপালকুণ্ডলা চরিত্র সমালোচন' (ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত) প্রকাশিত

---

* বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পৃ. ৭৩-৭৫। † বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ৫০-৫১। ‡ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৮-৪৯।

হইয়াছে। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ('বঙ্কিমচন্দ্র'), পূর্ণচন্দ্র বসু ('কাব্যসুন্দরী' ও 'সাহিত্য-চিন্তা'), হারাণচন্দ্র রক্ষিত ('বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম'), শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত ('বঙ্কিমচন্দ্র'), শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত ('A Critical study of the Life and Novels of Bankim Candra'), শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী ('বঙ্কিমচিত্র') প্রভৃতি 'কপালকুণ্ডলা'র আখ্যান ও চরিত্র লইয়া বহু তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ইংরেজী বাংলা বহু সাময়িক পত্রের প্রবন্ধেও 'কপালকুণ্ডলা' আলোচিত হইয়াছে।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর মুখোপাধ্যায় 'মৃণ্ময়ী' নাম দিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র পরিশিষ্ট-স্বরূপ একখানি উপন্যাস প্রকাশ করেন।

'কপালকুণ্ডলা' বিভিন্ন ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। ১৮৭৬-৭৭ সালে 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিনে' 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এইচ. এ. ডি. ফিলিপ্‌স্ লণ্ডন হইতে 'কপালকুণ্ডলা'র একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা (প্রফেসর ক্লেম কর্তৃক) জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডি. এন. ঘোষ কর্তৃক কলিকাতা হইতে 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত হরিচরণ বিদ্যারত্ন ইহার সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত ইহা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক হিন্দী, গুজরাটী, তামিল ও তেলুগু ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছে।

'Literary History of India' (1898, London) গ্রন্থে আর. ডব্লু. ফ্রেজার 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকা শেষ করিতেছি—

The novel throughout moves steadily to its purpose. There is no over-elaboratio ., no undue working after effect ; everywhere there are signs of the work of an artist whose hand falters not as he chisels out his lines with classic grace. The force that moves the whole with emotion, and gives to it its subtle spell, is the mystic form of Eastern thought that clearly shows the new forms that lie ready for inspiring a new school of fiction with fresh life. Outside the 'Mariage de Loti' there is nothing comparable to the 'Kopala Kundala' in the history of Western fiction......

(3rd. Imp., 1915, p. 423.)

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

—•—

সাগরসঙ্গমে

"Floating straight obedient to the stream."

Comedy of Errors.

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্ত্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। এক জন প্রাচীন এবং এক জন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্ত্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কত দূর যেতে পার্‌বি?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সম্বৎসর খাবে কি?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আস্‌ব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

এক জন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই—এ ত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোন বিপদ্ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কি হয়েছে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল, কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না—পাছে বাহির-সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকামধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটী স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন ?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোন মতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্য্যোদয় হইবে। চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্ ; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটী স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচ পীরের নাম কীর্ত্তিত করিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি ! কি ! মাঝি, কি হইয়াছে ?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে ! রোদ উঠেছে ! ঐ দেখ ডাঙ্গা !" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য্যপ্রকাশ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে,—এমন কি, পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দ্দম নদীজলবর্ণ ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন ; তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল

নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তট-মধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

উপকূলে

"Ingratitude! Thou marbel-hearted fiend!—"

King Lear.

আরোহীদিগের স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে;—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহিবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন নাবিকেরা তরি তীরলগ্ন করিলে আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া এক জন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠার হস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে ;—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্‌ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না ; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্ম্মে অভ্যাস ছিল না ; সম্যক্‌ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোন মতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন ; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল ; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইল। অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিল, ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে, জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি তীরবর্ত্তী থাকিলে তাহা খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদী-মধ্যবর্ত্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতে সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে স্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে ; নৌকা সামলাইতে পারিল না ; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। এক জন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল

যে ?" এক জন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে ? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এই জন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘ মাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা রসুলপুর নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্দ্ধ মাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রতিবর্ত্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পর দিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্য্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুই দিন নিরাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবেক। বিশেষ নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত; তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য ?

এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

বিজনে

"—Like a veil,
Which if withdrawn, would but disclose the frown
Of one who hates us, so the night was shown
And grimly darkled o'er their faces pale
And hopeless eyes."

Don Juan.

যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না; অরণ্যময় মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অনুদ্ঘাতিনী, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তূপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্নসূর্য্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্যা ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগ-মণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে, ঝাটী, বনঝাউ, এবং বনপুষ্পই অধিক।

এইরূপ অপ্রফুল্লকর স্থানে নবকুমার সঙ্গিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কাষ্ঠভার লইয়া নদীতীরে আসিয়া নৌকা দেখিলেন না; তখন তাঁহার অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সঙ্গিগণ যে তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমত বোধ হইল না। বিবেচনা করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে সৈকতভূমি প্লাবিত হওয়ায় তাঁহারা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানে নৌকা রক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবেন। এই প্রত্যাশায় কিয়ংক্ষণ তথায় বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন;

কিন্তু নৌকা আইল না। নৌকারোহীও কেহ দেখা দিল না। নবকুমার ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, নৌকার সন্ধানে নদীর তীরে তীরে ফিরিতে লাগিলেন। কোথাও নৌকার সন্ধান পাইলেন না, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিলেন। তখন পর্য্যন্ত নৌকা না দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, জোয়ারের বেগে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে; এখন প্রতিকূল স্রোতে প্রত্যাগমন করিতে সঙ্গীদিগের কাজে কাজেই বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু জোয়ারও শেষ হইল। তখন ভাবিলেন, প্রতিকূল স্রোতের বেগাধিক্যবশতঃ জোয়ারে নৌকা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই; এক্ষণে ভাঁটায় অবশ্য ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভাঁটাও ক্রমে অধিক হইল—ক্রমে ক্রমে বেলাবসান হইয়া আসিল; সূর্য্যাস্ত হইল। যদি নৌকা ফিরিয়া আসিবার হইত, তবে এতক্ষণ ফিরিয়া আসিত।

তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল যে, হয় জলোচ্ছ্বাসসম্ভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

নবকুমার দেখিলেন যে, গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই, পেয় নাই; নদীর জল অসহ্য লবণাত্মক; অথচ ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত শীতনিবারণজন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল-বায়ু-সঞ্চারিত-নদী-তীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে, নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। রাত্রিমধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা। প্রাণনাশই নিশ্চিত।

মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার এক স্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, হিমবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও উপত্যকায়, কখনও অধিত্যকায়, কখনও স্তূপতলে, কখনও স্তূপশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রতিপদে হিংস্র পশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক স্থানে বসিয়া থাকিলেও সেই আশঙ্কা।

ভ্রমণ করিতে করিতে নবকুমারের শ্রম জন্মিল। সমস্ত দিন অনাহার; এজন্য অধিক অবসন্ন হইলেন। এক স্থানে বালিয়াড়ির পার্শ্বে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া বসিলেন। গৃহের

সুখতপ্ত শয্যা মনে পড়িল। যখন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের অবসাদে চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন কখনও কখনও নিদ্রা আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। নবকুমার চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। বোধ হয় যদি এরূপ নিয়ম না থাকিত, তবে সাংসারিক ক্লেশের অপ্রতিহত বেগ সকলে সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

---*---

স্তূপশিখরে

"———সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে,
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি।"

মেঘনাদবধ

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। এখনও যে তাঁহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র আসিতেছে কি না। অকস্মাৎ সম্মুখে, বহুদূরে, একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এজন্য নবকুমার মনোভিনিবেশপূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আলোকপরিধি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন এবং উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল—আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইল। প্রতীতিমাত্র নবকুমারের জীবনাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্যসমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না, কেন না, এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন। যথায় আলোক, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন, "এ আলোক ভৌতিক?—হইতেও পারে; কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবন রক্ষা হয়?" এই ভাবিয়া নির্ভীকচিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বৃক্ষ, লতা, বালুকাস্তূপ পদে পদে তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। বৃক্ষ লতা দলিত করিয়া, বালুকাস্তূপ লঙ্ঘিত করিয়া নবকুমার চলিলেন। আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তৎপ্রভায়

শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। নবকুমার শিখরাসীন মনুষ্যের সমীপবর্ত্তী হইবেন স্থির সঙ্কল্প করিয়া, অশিথিলীকৃত বেগে চলিলেন। পরিশেষে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। তখন কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইতে লাগিল—তথাপি অকম্পিতপদে স্তূপারোহণ করিতে লাগিলেন। আসীন ব্যক্তির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যাহা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিষ্ঠিবেন কি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা-পরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন, কি স্থানত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদিগের কথা শ্রুত ছিলেন। বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।

যখন নবকুমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কাপালিক মন্ত্রসাধনে বা জপে বা ধ্যানে মগ্ন ছিল, নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কস্ত্বং ?" নবকুমার কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

কাপালিক কহিল, "তিষ্ঠ।" এই কহিয়া পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। নবকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রহরার্দ্ধ গত হইল। পরিশেষে কাপালিক গাত্রোত্থান করিয়া নবকুমারকে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতে কহিল, "মামনুসর।"

ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, অন্য সময়ে নবকুমার কদাপি ইহার সঙ্গী হইতেন না। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। অতএব কহিলেন, "প্রভুর যেমত

আজ্ঞা। কিন্তু আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় বড় কাতর। কোথায় গেলে আহার্য্য সামগ্রী পাইব অনুমতি করুন্।"

কাপালিক কহিল, "ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি; মামনুসর; পরিতোষং তে ভবিষ্যতি।"

নবকুমার কাপালিকের অনুগামী হইলেন। উভয়ে অনেক পথ বাহিত করিলেন—পথিমধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। পরিশেষে এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইল—কাপালিক প্রথমে প্রবেশ করিয়া নবকুমারকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিল; এবং নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে একখণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিত করিল। নবকুমার তদালোকে দেখিলেন যে, ঐ কুটীর সর্ব্বাংশে কিয়াপাতায় রচিত। তন্মধ্যে কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে—এক কলস জল ও কিছু ফলমূল আছে।

কাপালিক অগ্নি জ্বালিত করিয়া কহিল, "ফলমূল যাহা আছে আত্মসাৎ করিতে পার। পর্ণপাত্র রচনা করিয়া, কলসজল পান করিও। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে, অভিরুচি হইলে শয়ন করিও। নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠ—ব্যাঘ্রের ভয় করিও না। সময়ান্তরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত এ কুটীর ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া কাপালিক প্রস্থান করিল। নবকুমার সেই সামান্য ফলমূল আহার করিয়া এবং সেই ঈষত্তিক্ত জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পরে ব্যাঘ্রচর্ম্মে শয়ন করিলেন, সমস্ত দিবসজনিত ক্লেশহেতু শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

সমুদ্রতটে

"————যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্॥"

রঘুবংশ

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটী গমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন; বিশেষ এ কাপালিকের সান্নিধ্য কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু আপাততঃ

এ পথহীন বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটী যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানে, জিজ্ঞাসিলে কি বলিয়া দিবে না? বিশেষ, যত দূর দেখা গিয়াছে, তত দূর কাপালিক তাঁহার প্রতি কোন শঙ্কাসূচক আচরণ করে নাই—কেনই বা তবে তিনি ভীত হন? এ দিকে কাপালিক তাঁহাকে পুনঃসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কুটীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে বরং তাহার রোষোৎপত্তির সম্ভাবনা। নবকুমার শ্রুত ছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধনে সক্ষম—এ কারণে তাহার অবাধ্য হওয়া অনুচিত। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার আপাততঃ কুটীরমধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিল না। পূর্ব্বদিনের উপবাস, অদ্য এ পর্য্যন্ত অনশন, ইহাতে ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। কুটীরমধ্যে যে অল্পপরিমাণ ফলমূল ছিল, তাহা পূর্ব্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল - এক্ষণে কুটীর ত্যাগ করিয়া ফলমূলান্বেষণ না করিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।

নবকুমার ফলান্বেষণে নিকটস্থ বালুকাস্তূপসকলের চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দুই একটা গাছ বালুকায় জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলাস্বাদন করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃক্ষের ফল বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু। তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিলেন।

কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প, অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া তাহা পার হইলেন। তৎপরে বালুকাবিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা ক্ষণকালজন্য অপূর্ব্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যত দূর চক্ষুঃ যায়, তত দূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড

বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবেক। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বলিতে পারি না—তখন তাঁহার মনে কোন্ ভূতপূর্ব্ব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বলিবে? গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদ-নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাললোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটী মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গমমধ্যে দৈবী মূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল;—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুই জনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?"

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটী শব্দে, একটী রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়। সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?" এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।

রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস।" এই বলিয়া তরুণী চলিল; পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে, অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপে চলিল; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে, বনের অন্তরালে গেলে, আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। বনবেষ্টনের পর দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—*—

কাপালিকসঙ্গে

"কথং নিগড়সংযতাসি। দ্রুতম্
নয়ামি ভবতীমিতঃ——"

রত্নাবলী

নবকুমার কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারসংযোজনপূর্ব্বক করতলে মস্তক দিয়া বসিলেন। শীঘ্র আর মস্তকোত্তোলন করিলেন না।

"এ কি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়ামাত্র!" নবকুমার নিস্পন্দ হইয়া হৃদয়মধ্যে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া, নবকুমার আর একটী ব্যাপার দেখিতে পান নাই। সেই কুটীরমধ্যে তাঁহার আগমনপূর্ব্বাবধি একখানি কাষ্ঠ জ্বলিতেছিল। পরে যখন অনেক রাত্রে স্মরণ হইল যে, সায়াহ্নকৃত্য অসমাপ্ত রহিয়াছে—তখন জলান্বেষণ অনুরোধে চিন্তা হইতে ক্ষান্ত হইয়া এ বিষয়ের অসম্ভাবিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। শুধু আলো নহে, তণ্ডুলাদি পাকোপযোগী কিছু কিছু সামগ্রীও আছে। নবকুমার বিস্মিত হইলেন না—মনে করিলেন যে, এও কাপালিকের কর্ম্ম—এ স্থানে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে।

নবকুমার সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে তণ্ডুলগুলি কুটীরমধ্যে প্রাপ্ত এক মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে চর্ম্মশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই সমুদ্রতীরাভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্বদিনের যাতায়াতের গুণে অদ্য অল্প কষ্টে পথ অনুভূত করিতে পারিলেন। তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন? পূর্ব্বদৃষ্টা মায়াবিনী পুনর্ব্বার সে স্থলে যে আসিবেন—এমত আশা নবকুমারের হৃদয়ে কত দূর প্রবল হইয়াছিল বলিতে পারি না—কিন্তু সে স্থান তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনেক বেলাতেও তথায় কেহ আসিল না। তখন নবকুমার সে স্থানের চারি দিকে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃথা অন্বেষণ মাত্র। মনুষ্যসমাগমের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইল; অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল; নবকুমার হতাশ হইয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। সায়াহ্নকালে সমুদ্রতীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, কাপালিক কুটীরমধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে। নবকুমার প্রথমে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে কাপালিক কোন উত্তর করিল না।

নবকুমার কহিলেন, "এ পর্য্যন্ত প্রভুর দর্শনে কি জন্য বঞ্চিত ছিলাম?" কাপালিক কহিল, "নিজ ব্রতে নিযুক্ত ছিলাম।"

নবকুমার গৃহগমনাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "পথ অবগত নহি—পাথেয় নাই; যদ্বিহিতবিধান প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেই হইতে পারিবে, এই ভরসায় আছি।"

কাপালিক কেবলমাত্র কহিল, "আমার সঙ্গে আগমন কর।" এই বলিয়া উদাসীন গাত্রোত্থান করিলেন। বাটী যাইবার কোন সদুপায় হইতে পারিবে প্রত্যাশায় নবকুমারও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই—কাপালিক অগ্রে অগ্রে, নবকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল করস্পর্শ হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্পন্দহীন হইলেন। সেই আগুল্‌ফলম্বিত-নিবিড়কেশরাশি-ধারিণী বন্যদেবীমূর্ত্তি! পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দ নিস্পন্দ। কোথা হইতে এ মূর্ত্তি অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাতে আসিল! নবকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া আছে। নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাক্যস্ফূর্ত্তি নিষেধ করিতেছে, নিষেধের বড় প্রয়োজন ছিল না। নবকুমার কি কথা কহিবেন? তিনি তথায় চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাপালিক এ সকল কিছুই দেখিতে পাইল না, অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। তাহারা উদাসীনের শ্রবণাতিক্রান্ত হইলে রমণী মৃদুস্বরে কি কথা কহিল। নবকুমারের কর্ণে এই শব্দ প্রবেশ করিল,

"কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।"

এই কথা সমাপ্ত করিয়াই উক্তিকারিণী সরিয়া গেলেন, প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য তিষ্ঠিলেন না। নবকুমার কিয়ৎকাল অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইলেন; পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু রমণী কোন্ দিকে গেল, তাহার কিছুই স্থিরতা পাইলেন না। মনে করিতে লাগিলেন—"এ কাহার মায়া? না আমারই ভ্রম হইতেছে। যে কথা শুনিলাম—সে ত আশঙ্কাসূচক, কিন্তু কিসের আশঙ্কা? তান্ত্রিকেরা সকলই করিতে পারে। তবে কি পলাইব? পলাইব বা কেন? সেদিন যদি বাঁচিয়াছি, আজিও বাঁচিব। কাপালিকও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য।"

নবকুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, কাপালিক তাঁহাকে সঙ্গে না দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতেছে। কাপালিক কহিল, "বিলম্ব করিতেছ কেন?"

কাপালিক পুনরাহ্বান করাতে বিনা বাক্যব্যয়ে নবকুমার তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে এক মৃৎপ্রাচীরবিশিষ্ট কুটীর দেখিতে পাইলেন। তাহাকে কুটীরও বলা যাইতে পারে, ক্ষুদ্র গৃহও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার পশ্চাতেই সিকতাময় সমুদ্রতীর। গৃহপার্শ্ব দিয়া কাপালিক নবকুমারকে সেই সৈকতে লইয়া চলিলেন; এমত সময় তীরের তুল্য বেগে

পূর্ব্বদৃষ্টা রমণী তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল; গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, "এখনও পলাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?"

নবকুমারের কপালে স্বেদনির্গম হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবতীর এই কথা কাপালিকের কর্ণে গেল। সে কহিল, "কপালকুণ্ডলে!"

স্বর নবকুমারের কর্ণে মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না।

কাপালিক নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মানুষঘাতী করস্পর্শে নবকুমারের শোণিত ধমনীমধ্যে শতগুণ বেগে প্রধাবিত হইল—লুপ্ত সাহস পুনর্ব্বার আসিল। কহিলেন, "হস্ত ত্যাগ করুন।"

কাপালিক উত্তর করিল না। নবকুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

কাপালিক কহিল, "পূজার স্থানে।"

নবকুমার কহিলেন, "কেন?"

কাপালিক কহিল, "বধার্থ।"

অতিতীব্রবেগে নবকুমার নিজ হস্ত টানিলেন। যে বলে তিনি হস্ত আকর্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সামান্য লোকে তাঁহার হাত ধরিয়া থাকিলে হস্তরক্ষা করা দূরে থাকুক—বেগে ভূপতিত হইত। কিন্তু কাপালিকের অঙ্গমাত্রও হেলিল না;—নবকুমারের প্রকোষ্ঠ তাহার হস্তমধ্যেই রহিল। নবকুমারের অস্থিগ্রন্থিসকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল। নবকুমার দেখিলেন, বলে হইবে না। কৌশলের প্রয়োজন। "ভাল দেখা যাউক,"—এইরূপ স্থির করিয়া নবকুমার কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সৈকতের মধ্যস্থানে নীত হইয়া নবকুমার দেখিলেন, পূর্ব্বদিনের ন্যায় তথায় বৃহৎ কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছে। চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিকপূজার আয়োজন রহিয়াছে, তন্মধ্যে নরকপালপূর্ণ আসব রহিয়াছে—কিন্তু শব নাই। অনুমান করিলেন, তাঁহাকে শব হইতে হইবে।

কতকগুলি শুষ্ক, কঠিন লতাগুল্ম তথায় পূর্ব্ব হইতেই আহরিত ছিল। কাপালিক তদ্দ্বারা নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। নবকুমার সাধ্যমত বল প্রকাশ করিলেন; কিন্তু বল প্রকাশ কিছুমাত্র ফলদায়ক হইল না। তাঁহার প্রতীতি হইল যে, এ বয়সেও কাপালিক মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে। নবকুমারের বলপ্রকাশ দেখিয়া কাপালিক কহিল,

"মূর্খ! কি জন্য বল প্রকাশ কর? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?"

কাপালিক নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া সৈকতোপরি ফেলিয়া রাখিলেন। এবং বধের প্রাক্কালিক পূজাদি ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলেন। ততক্ষণ নবকুমার বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শুষ্ক লতা অতি কঠিন—বন্ধন অতিদৃঢ়। মৃত্যু আসন্ন! নবকুমার ইষ্টদেবচরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। একবার জন্মভূমি মনে পড়িল, নিজ সুখের আলয় মনে পড়িল, একবার বহুদিন অন্তর্হিত জনক এবং জননীর মুখ মনে পড়িল, দুই এক বিন্দু অশ্রুজল সৈকত-বালুকায় শুষিয়া গেল। কাপালিক বলির প্রাক্কালিক ক্রিয়া সমাপনান্তে বধার্থ খড়্গ লইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। কিন্তু যথায় খড়্গ রাখিয়াছিল, তথায় খড়্গ পাইল না। আশ্চর্য্য! কাপালিক কিছু বিস্মিত হইল। তাহার নিশ্চিত মনে হইতেছিল যে, অপরাহ্ণে খড়্গ আনিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছিল এবং স্থানান্তরও করে নাই, তবে খড়্গ কোথায় গেল? কাপালিক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল। কোথাও পাইল না। তখন পূর্ব্বকথিত কুটীরাভিমুখ হইয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিল, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ডাকাতেও কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না। তখন কাপালিকের চক্ষু লোহিত, ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত হইল। দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিল; এই অবকাশে বন্ধনলতা ছিন্ন করিতে নবকুমার আর একবার যত্ন পাইলেন—কিন্তু সে যত্নও নিষ্ফল হইল।

এমত সময়ে নিকটে বালুকার উপর অতি কোমল পদধ্বনি হইল—এ পদধ্বনি কাপালিকের নহে। নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই মোহিনী—কপালকুণ্ডলা। তাঁহার করে খড়্গ দুলিতেছে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "চুপ! কথা কহিও না—খড়্গ আমারই কাছে—চুরি করিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা অতি শীঘ্রহস্তে নবকুমারের লতাবন্ধন খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। নিমিষমধ্যে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। কহিলেন, "পলায়ন কর; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা তীরের ন্যায় বেগে পথ দেখাইয়া চলিলেন। নবকুমার লাফ দিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ✓

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—•—

অন্বেষণে

"And the great lord of Luna
Fell at that deadly stroke;
As falls on mount Alvernus
A thunder-smitten oak."

Lays of Ancient Rome.

এদিকে কাপালিক গৃহমধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, না খড়্গ না কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে সৈকতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তথায় আসিয়া দেখিল যে, নবকুমার তথায় নাই। ইহাতে অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই ছিন্ন লতাবন্ধনের উপর দৃষ্টি পড়িল। তখন স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিয়া কাপালিক নবকুমারের অন্বেষণে ধাবিত হইল। কিন্তু বিজনমধ্যে পলাতকেরা কোন্ দিকে কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। অন্ধকারবশতঃ কাহাকেও দৃষ্টিপথবর্ত্তী করিতে পারিল না। এজন্য বাক্যশব্দ লক্ষ্য করিয়া ক্ষণেক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সকল সময়ে কণ্ঠধ্বনিও শুনিতে পাওয়া গেল না। অতএব বিশেষ করিয়া চারি দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রা৻: এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিল। কাপালিক এক পার্শ্ব দিয়া উঠিল; তাহার অন্যতর পার্শ্বে বর্ষার জলপ্রবাহে স্তূপমূল ক্ষয়িত হইয়াছিল, তাহা সে জানিত না। শিখরে আরোহণ করিবামাত্র কাপালিকের শরীরভরে সেই পতনোন্মুখ স্তূপশিখর ভগ্ন হইয়া অতি ঘোররবে ভূপতিত হইল। পতনকালে পর্ব্বত-শিখরচ্যুত মহিষের ন্যায় কাপালিকও তৎসঙ্গে পড়িয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আশ্রয়ে

"And that very night—
Shall Romeo bear thee to Mantua."

Romeo and Juliet.

সেই অমাবস্থার ঘোরান্ধকার যামিনীতে দুই জনে ঊর্দ্ধশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্য পথ নবকুমারের অপরিজ্ঞাত; কেবল সহচারিণী ষোড়শীকে লক্ষ্য করিয়া তদ্বর্ত্ম সম্বর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। মনে মনে ভাবিলেন, "এও কপালে ছিল!" নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ করিতেন না। ক্রমে তাঁহারা পাদক্ষেপ মন্দ করিয়া চলিতে লাগিলেন। অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না; কেবল কখন কোথাও নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট দেখা যায়—কোথাও খদ্যোতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয়।

কপালকুণ্ডলা পথিককে সমভিব্যাহারে লইয়া, নিভৃত কাননাভ্যন্তরে উপনীত হইলেন। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সম্মুখে অন্ধকারে বনমধ্যে এক অত্যুচ্চ দেবালয়চূড়া লক্ষিত হইল; তন্নিকটে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটী গৃহও দেখা গেল। কপালকুণ্ডলা প্রাচীরদ্বারের নিকটস্থ হইয়া তাহাতে করাঘাত করিতে লাগিলেন; পুনঃ পুনঃ করাঘাত করাতে ভিতর হইতে এক ব্যক্তি কহিল, "কে ও, কপালকুণ্ডলা বুঝি?" কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দ্বার খোল।"

উত্তরকারী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। যে ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দিল, সে ঐ দেবালয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেবক বা অধিকারী; বয়সে পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাঁহার বিরলকেশ মস্তক কর দ্বারা আকর্ষিত করিয়া আপন অধরের নিকট তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় আনিলেন এবং দুই চারি কথায় নিজ সঙ্গীর অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। অধিকারী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত করতললগ্নশীর্ষ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে কহিলেন, "এ বড় বিষম ব্যাপার। মহাপুরুষ মনে করিলে সকল করিতে পারেন। যাহা হউক, মায়ের প্রসাদে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে না। সে ব্যক্তি কোথায়?"

কপালকুণ্ডলা, "আইস" বলিয়া নবকুমারকে আহ্বান করিলেন। নবকুমার অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিলেন, আহূত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অধিকারী তাঁহাকে কহিলেন, "আজি এইখানে লুকাইয়া থাক, কালি প্রত্যূষে তোমাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

ক্রমে কথায় কথায় অধিকারী জানিতে পারিলেন যে, এ পর্য্যন্ত নবকুমারের আহারাদি হয় নাই। ইহাতে অধিকারী তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নবকুমার আহারে নিতান্ত অস্বীকৃত হইয়া কেবলমাত্র বিশ্রামস্থানের প্রার্থনা জানাইলেন। অধিকারী নিজ রন্ধনশালায় নবকুমারের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নবকুমার শয়ন করিলে, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। অধিকারী তাঁহার প্রতি সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,

"যাইও না। ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।"

কপালকুণ্ডলা। কি?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না?

কপা। করিব না।

অধি। আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।

কপা। কেন?

অধি। গেলে তোমার রক্ষা নাই।

কপা। তা ত জানি।

অধি। তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন?

কপা। না গিয়া কোথায় যাইব?

অধি। এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।

কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী কহিলেন, "মা, কি ভাবিতেছ?"

কপা। যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত; এখন যাইতে বল কেন?

অধি। তখন তোমার জীবনের আশঙ্কা করি নাই, বিশেষ যে সদুপায়ের সম্ভাবনা ছিল না, এখন সে সদুপায় হইতে পারিবে। আইস, মায়ের অনুমতি লইয়া আসি।

এই বলিয়া অধিকারী দীপহস্তে দেবালয়ের দ্বারে গিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। কপালকুণ্ডলাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মন্দিরমধ্যে মানবাকারপরিমিতা করাল-কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। অধিকারী আচমন করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটী অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন, এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন,

"মা, দেখ, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন; বিল্বপত্র পড়ে নাই, যে মানস করিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিলাম, তাহাতে অবশ্য মঙ্গল। তুমি এই পথিকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গমন কর; কিন্তু আমি বিষয়ী লোকের রীতি চরিত্র জানি। তুমি যদি গলগ্রহ হইয়া ইহার সঙ্গে যাও, তবে এ ব্যক্তি অপরিচিত যুবতী সঙ্গে লইয়া লোকালয়ে লজ্জা পাইবে। তোমাকে লোকে ঘৃণা করিবে। তুমি বলিতেছ, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণসন্তান; গলাতেও যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি। এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার সহিত যাইতে বলিতে পারি না।"

"বি—বা—হ!" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, "বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?"

অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।"

অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন। বলিলেন,

"তাহাই হউক। কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এত দিন প্রতিপালন করিয়াছেন।"

অধি। কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না।

এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না, কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল। বলিল, "তবে বিবাহই হউক।"

এই বলিয়া উভয়ে মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। এক কক্ষমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে বসাইয়া, অধিকারী নবকুমারের শয্যাসন্নিধানে গিয়া তাঁহার শিওরে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! নিদ্রিত কি?"

নবকুমারের নিদ্রা যাইবার অবস্থা নহে; নিজদশা ভাবিতেছিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞা না।"

অধিকারী কহিলেন, "মহাশয়! পরিচয়টা লইতে একবার আসিলাম, আপনি ব্রাহ্মণ?"

নব। আজ্ঞা হাঁ।

অধি। কোন্ শ্রেণী?

নব। রাঢ়ীয় শ্রেণী।

অধি। আমরাও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ—উৎকলব্রাহ্মণ বিবেচনা করিবেন না। বংশে কুলাচার্য্য, তবে এক্ষণে মায়ের পদাশ্রয়ে আছি। মহাশয়ের নাম?

নব। নবকুমার শর্ম্মা।

অধি। নিবাস?

নব। সপ্তগ্রাম।

অধি। আপনারা কোন্ গাঁই?

নব। বন্দ্যঘটী।

অধি। কয় সংসার করিয়াছেন?

নব। এক সংসার মাত্র।

নবকুমার সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এক সংসারও ছিল না। তিনি রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতী কিছু দিন পিত্রালয়ে রহিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন। এই সময়ে পাঠানেরা আকবরশাহ কর্তৃক বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যায় সদলে বসতি করিতেছিল। তাহাদিগের দমনের জন্য আকবরশাহ বিধিমতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। যখন রামগোবিন্দ ঘোষাল উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন মোগল পাঠানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আগমনকালে তিনি পথিমধ্যে পাঠান-সেনার হস্তে পতিত হয়েন। পাঠানেরা তৎকালে ভদ্রাভদ্র বিচারশূন্য; তাহারা নিরপরাধী

পথিকের প্রতি অর্থের জন্য বলপ্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। রামগোবিন্দ কিছু উগ্রস্বভাব; পাঠানদিগকে কটু কহিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন; পরিশেষে জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে প্রাণ লইয়া বাটী আসিলেন বটে, কিন্তু মুসলমান বলিয়া আত্মীয় জনসমাজে এককালীন পরিত্যক্ত হইলেন। এ সময় নবকুমারের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাকে সুতরাং জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের সহিত জাতিভ্রষ্টা পুত্রবধূকে ত্যাগ করিতে হইল। আর নবকুমারের সহিত তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল না।

স্বজনত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হইয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অধিক দিন স্বদেশে বাস করিতে পারিলেন না। এই কারণেও বটে, এবং রাজপ্রসাদে উচ্চপদস্থ হইবার আকাঙ্ক্ষায়ও বটে, তিনি সপরিবারে রাজধানী রাজমহলে গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি সপরিবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করিয়াছিলেন। রাজমহলে যাওয়ার পরে শ্বশুরের বা বনিতার কি অবস্থা হইল, তাহা নবকুমারের জানিতে পারিবার কোন উপায় রহিল না এবং এ পর্য্যন্ত কখন কিছু জানিতেও পারিলেন না। নবকুমার বিরাগবশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। এই জন্য বলিতেছি, নবকুমারের "এক সংসারও" নহে।

অধিকারী এ সকল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, "কুলীনের সন্তানের দুই সংসারে আপত্তি কি?" প্রকাশ্যে কহিলেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। এই যে কন্যা আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে—এ পরহিতার্থ আত্মপ্রাণ নষ্ট করিয়াছে। যে মহাপুরুষের আশ্রয়ে ইহার বাস, তিনি অতি ভয়ঙ্করস্বভাব। তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিলে, আপনার যে দশা ঘটিতেছিল, ইহার সেই দশা ঘটিবে। ইহার কোন উপায় বিবেচনা করিতে পারেন কি না?"

নবকুমার উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "আমিও সেই আশঙ্কা করিতেছিলাম। আপনি সকল অবগত আছেন—ইহার উপায় করুন। আমার প্রাণদান করিলে যদি কোন প্রত্যুপকার হয়,—তবে তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমি এমন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলে ইহার রক্ষা হইবে।" অধিকারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বাতুল। ইহাতে কি ফল দর্শিবে? তোমারও প্রাণসংহার হইবে—অথচ ইহার প্রতি মহাপুরুষের ক্রোধোপশম হইবে না। ইহার একমাত্র উপায় আছে।"

নব। সে কি উপায় ?

অধি। আপনার সহিত ইহার পলায়ন। কিন্তু সে অতি দুর্ঘট। আমার এখানে থাকিলে দুই এক দিনের মধ্যে ধৃত হইবে। এ দেবালয়ে মহাপুরুষের সর্ব্বদা যাতায়াত। সুতরাং কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টে অশুভ দেখিতেছি।

নবকুমার আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত পলায়ন দুর্ঘট কেন ?"

অধি। এ কাহার কন্যা,—কোন্ কুলে জন্ম, তাহা আপনি কিছুই জানেন না। কাহার পত্নী,—কি চরিত্রা, তাহা কিছুই জানেন না। আপনি ইহাকে কি সঙ্গিনী করিবেন ? সঙ্গিনী করিয়া লইয়া গেলেও কি আপনি ইহাকে নিজগৃহে স্থান দিবেন ? আর যদি স্থান না দেন, তবে এ অনাথা কোথায় যাইবে ?

নবকুমার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার প্রাণরক্ষয়িত্রীর জন্য কোন কার্য্য আমার অসাধ্য নহে। ইনি আমার আত্মপরিবারস্থা হইয়া থাকিবেন।"

অধি। ভাল। কিন্তু যখন আপনার আত্মীয় স্বজন জিজ্ঞাসা করিবে যে, এ কাহার স্ত্রী, কি উত্তর দিবেন ?

নবকুমার পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনিই ইহার পরিচয় আমাকে দিন। আমি সেই পরিচয় সকলকে দিব।"

অধি। ভাল। কিন্তু এই পক্ষান্তরের পথ যুবক যুবতী অনন্যসহায় হইয়া কি প্রকারে যাইবে ? লোকে দেখিয়া শুনিয়া কি বলিবে ? আত্মীয় স্বজনের নিকট কি বুঝাইবে ? আর আমিও এই কন্যাকে মা বলিয়াছি, আমিই বা কি প্রকারে ইহাকে অজ্ঞাতচরিত্র যুবার সহিত একাকী দূরদেশে পাঠাইয়া দিই ?

ঘটকরাজ ঘটকালিতে মন্দ নহেন।

নবকুমার কহিলেন, "আপনি সঙ্গে আসুন।"

অধি। আমি সঙ্গে যাইব ? ভবানীর পূজা কে করিবে ?

নবকুমার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "তবে কি কোন উপায় করিতে পারেন না ?"

অধি। একমাত্র উপায় হইতে পারে,—সে আপনার ঔদার্য্য গুণের অপেক্ষা করে।

নব। সে কি ? আমি কিসে অস্বীকৃত ? কি উপায় বলুন ?

অধি। শুনুন। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইঁহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইঁহার নিকট আপনি

সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধি-মানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া; ইঁহার চরিত্র পরম পবিত্র। আপনি ইঁহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।

নবকুমার শয্যা হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। অধিকারী কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন,

"আপনি এক্ষণে নিদ্রা যান। কল্য প্রত্যূষে আপনাকে আমি জাগরিত করিব। ইচ্ছা হয়, একাকী যাইবেন। আপনাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

এই বলিয়া অধিকারী বিদায় হইলেন। গমনকালে মনে মনে করিলেন, "রাঢ়দেশের ঘটকালি কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি ?"

নবম পরিচ্ছেদ

দেবনিকেতনে

"কণ্ব। অলং রুদিতেন ; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।"

শকুন্তলা

প্রাতে অধিকারী নবকুমারের নিকট আসিলেন। দেখিলেন, এখনও নবকুমার শয়ন করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি কর্ত্তব্য ?"

নবকুমার কহিলেন, "আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্ম্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। কে কন্যা সম্প্রদান করিবে ?"

ঘটকচূড়ামণির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত দিনে জগদম্বার কৃপায় আমার কপালিনীর বুঝি গতি হইল।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি সম্প্রদান করিব।" অধিকারী নিজ শয়নকক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। একটী খুঙ্গীর মধ্যে কয়েক খণ্ড অতি জীর্ণ তালপত্র ছিল। তাহাতে তাঁহার তিথি নক্ষত্রাদি নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

তৎসমুদায় সবিশেষ সমালোচনা করিয়া আসিয়া কহিলেন, "আজি যদিও বৈবাহিক দিন নহে—তথাচ বিবাহে কোন বিঘ্ন নাই। গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিব। তুমি অদ্য উপবাস করিয়া থাকিবে মাত্র। কৌলিক আচরণ সকল বাটী গিয়া করাইও। এক দিনের জন্য তোমাদিগকে লুকাইয়া রাখিতে পারি, এমন স্থান আছে। আজি যদি তিনি আসেন, তবে তোমাদিগের সন্ধান পাইবেন না। পরে বিবাহান্তে কালি প্রাতে সপত্নীক বাটী যাইও।"

নবকুমার ইহাতে সম্মত হইলেন। এ অবস্থায় যত দূর সম্ভবে, তত দূর যথাশাস্ত্র কার্য্য হইল। গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিকপালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।

কাপালিকের কোন সংবাদ নাই। পরদিন প্রত্যূষে তিন জনে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অধিকারী মেদিনীপুরের পথ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালীপ্রণামার্থ গেলেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে একটী অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটী পড়িয়া গেল।

কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমাচরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন ;—এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। অধিকারীও বিষণ্ণ হইলেন। কহিলেন,

"এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।"

সকলে নিঃশব্দে চলিলেন। অনেক বেলা হইলে মেদিনীপুরের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাঁহার একমাত্র সুহৃদ্, সে বিদায় হইতেছে।

অধিকারীও কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষের জল মুছাইয়া কপালকুণ্ডলার কানে কানে কহিলেন, "মা! তুই জানিস্, পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলীর ছোট বড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়। তোর কাপড়ে যাহা বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহা তোর স্বামীর নিকট দিয়া তোকে পাল্কী করিয়া দিতে বলিস্।—সন্তান বলিয়া মনে করিস্।"

অধিকারী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন। কপালকুণ্ডলাও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

—*—

রাজপথে

"——There—now lean on me :
Place your foot here———"

Manfred.

নবকুমার মেদিনীপুরে আসিয়া অধিকারীর প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য এক জন দাসী, এক জন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইলেন। অর্থের অপ্রাচুর্য্য হেতু স্বয়ং পদব্রজে চলিলেন। নবকুমার পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, মধ্যাহ্নভোজনের পর বাহকেরা তাঁহাকে অনেক পশ্চাৎ করিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যাও অতীত হইল। পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত একত্র হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মনে স্থির জ্ঞান ছিল যে, প্রথম সরাইতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন, কিন্তু সরাইও আপাততঃ দেখা যায় না। প্রায় রাত্রি চারি ছয় দণ্ড হইল। নবকুমার দ্রুতপাদবিক্ষেপ করিতে করিতে চলিলেন। অকস্মাৎ কোন কঠিন দ্রব্যে তাঁহার চরণস্পর্শ হইল। পদভরে সে বস্তু খড়্ খড়্ মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। নবকুমার দাঁড়াইলেন; পুনর্ব্বার পদচালনা করিলেন; পুনর্ব্বার ঐরূপ হইল। পদস্পৃষ্ট বস্তু হস্তে করিয়া তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, ঐ বস্তু তক্তাভাঙ্গার মত।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও সচরাচর এমত অন্ধকার হয় না যে, অনাবৃত স্থানে স্থুল বস্তুর অবয়ব লক্ষ্য হয় না। সম্মুখে একটা বৃহৎ বস্তু পড়িয়া ছিল; নবকুমার অনুভব

করিয়া দেখিলেন যে, সে ভগ্ন শিবিকা, অমনি তাঁহার হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার বিপদ্ আশঙ্কা হইল। শিবিকার দিকে যাইতে আবার ভিন্ন প্রকার পদার্থে তাঁহার পাদস্পর্শ হইল। এ স্পর্শ কোমল মনুষ্যশরীরস্পর্শের ন্যায় বোধ হইল। বসিয়া হাত বুলাইয়া দেখিলেন, মনুষ্যশরীর বটে। স্পর্শ অত্যন্ত শীতল; তৎসঙ্গে দ্রবপদার্থের স্পর্শ অনুভূত হইল। নাড়ীতে হাত দিয়া দেখিলেন, স্পন্দ নাই, প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেন, যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। নিশ্বাস আছে, তবে নাড়ী নাই কেন? এ কি রোগী? নাসিকার নিকট হাত দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে না। তবে শব্দ কেন? হয়ত কোন জীবিত ব্যক্তিও এখানে আছে, এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছে?"

মৃদুস্বরে এক উত্তর হইল, "আছি।"

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "তুমি কে?" নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রীকণ্ঠজাত বোধ হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কপালকুণ্ডলা না কি?"

স্ত্রীলোক কহিল, "কপালকুণ্ডলা কে, তা জানি না—আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।"

ব্যঙ্গ শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে?"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আমার এক জন বাহককে মারিয়া ফেলিয়াছে; আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লইয়া আমাকে পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

নবকুমার অন্ধকারে অনুধাবন করিয়া দেখিলেন, যথার্থই একটী স্ত্রীলোক শিবিকাতে বস্ত্রদ্বারা দৃঢ় বন্ধনযুক্ত আছে। নবকুমার শীঘ্রহস্তে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া কহিলেন, "তুমি উঠিতে পারিবে কি?" স্ত্রীলোক কহিল, "আমাকেও এক ঘা লাঠি লাগিয়াছিল; এজন্য পায়ে বেদনা আছে; কিন্তু বোধ হয়, অল্প সাহায্য করিলে উঠিতে পারিব।"

নবকুমার হাত বাড়াইয়া দিলেন। রমণী তৎসাহায্যে গাত্রোত্থান করিলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "চলিতে পারিবে কি?"

স্ত্রীলোক উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পশ্চাতে কেহ পথিক আসিতেছে দেখিয়াছেন?"

নবকুমার কহিলেন, "না।"

স্ত্রীলোক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চটি কত দূর ?"

নবকুমার কহিলেন, "কত দূর বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয় নিকট।"

স্ত্রীলোক কহিল, "অন্ধকারে একাকিনী মাঠে বসিয়া কি করিব, আপনার সঙ্গে চটি পর্য্যন্ত যাওয়াই উচিত। বোধ হয়, কোন কিছুর উপর ভর করিতে পারিলে, চলিতে পারিব।"

নবকুমার কহিলেন, "বিপৎকালে সঙ্কোচ মূঢ়ের কাজ। আমার কাঁধে ভর করিয়া চল।"

স্ত্রীলোকটি মূঢ়ের কার্য্য করিল না। নবকুমারের স্কন্ধেই ভর করিয়া চলিল।

যথার্থই চটি নিকটে ছিল। এ সকল কালে চটির নিকটেও দুষ্ক্রিয়া করিতে দস্যুরা সঙ্কোচ করিত না। অনধিক বিলম্বে নবকুমার সমভিব্যাহারিণীকে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন।

নবকুমার দেখিলেন যে, ঐ চটিতেই কপালকুণ্ডলা অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার দাসদাসী তজ্জন্য একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়াছিল। নবকুমার স্বীয় সঙ্গিনীর জন্য তৎপার্শ্ববর্ত্তী একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাঁহার আজ্ঞামত গৃহস্বামীর বনিতা প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। যখন দীপরশ্মিস্রোতঃ তাঁহার সঙ্গিনীর শরীরে পড়িল, তখন নবকুমার দেখিলেন যে, ইনি অসামান্যা সুন্দরী। রূপরাশি-তরঙ্গে, তাঁহার যৌবনশোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

পান্থনিবাসে

"কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা"

উদ্ধবদূত

যদি এই রমণী নির্দ্দোষ সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, "পুরুষ পাঠক ! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি ! ইনি আপনার দর্পণস্থ

ছায়ার ন্যায় রূপবতী।” তাহা হইলে রূপবর্ণনার একশেষ হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নহেন, সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল।

ইনি যে নির্দ্দোষসুন্দরী নহেন, তাহা বলিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইঁহার শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ; দ্বিতীয়তঃ অধরৌষ্ঠ কিছু চাপা; তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে ইনি গৌরাঙ্গী নহেন।

শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপদ হৃদয়াদি সর্ব্বাঙ্গ সুগোল, সম্পূর্ণীভূত। বর্ষাকালে বিটপীলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইঁহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; সুতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্রকৌমুদীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদারক্তবদনা উষার ন্যায়। ইঁহার বর্ণ এতদুভয়বর্জ্জিত, সুতরাং ইঁহাকে প্রকৃত গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী শক্তিতে ইঁহার বর্ণও ন্যূন নহে। ইনি শ্যামবর্ণা। “শ্যামা মা” বা “শ্যামসুন্দর” যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে। তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকর-লেখা, অথবা হেমাম্বুদকিরীটিনী উষা, যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা হয়, তবে বসন্তপ্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠক মহাশয়-দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাঁহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্য বলিতে পারিব না। এ কথায় যাঁহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচূতপল্লববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর তুল্য, সেই উজ্জ্বলশ্যামললাট-বিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই সপ্তমীচন্দ্রাকৃতিললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ মনে করুন; সেই পক্বচূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন; তন্মধ্যবর্ত্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন, তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনুভব হইবে। চক্ষু দুইটী অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লবরেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তিপ্রকাশমাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখনও বা লালসাবিস্ফারিত, মদনরসে টলমলায়মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম। মুখকান্তিমধ্যে দুইটী অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম

সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণীকুলরাজ্ঞী।

সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর—ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্র মাসের নদীজলের ন্যায়, ইঁহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল—উছলিয়া পড়িতেছিল। বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্য্যের পরিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবনভরে সর্ব্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল; বিনা বায়ুতে শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল; সে চাঞ্চল্য মুহুর্মুহুঃ নূতন নূতন শোভাবিকাশের কারণ। নবকুমার নিমেষশূন্যচক্ষে সেই নূতন নূতন শোভা দেখিতেছিলেন।

সুন্দরী, নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন, "আপনি কি দেখিতেছেন, আমার রূপ?"

নবকুমার ভদ্রলোক; অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। নবকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন,

"আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?"

সহজে এ কথা কহিলে, তিরস্কারস্বরূপ বোধ হইত, কিন্তু রমণী যে হাসির সহিত বলিলেন, তাহাতে ব্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না। নবকুমার দেখিলেন, এ অতি মুখরা; মুখরার কথায় কেন না উত্তর করিবেন? কহিলেন,

"আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।"

রমণী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটীও না?"

নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল; তিনিও সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "একটীও না, এমত বলিতে পারি না।"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "তবুও ভাল। সেটী কি আপনার গৃহিণী?"

নব। কেন? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ?

স্ত্রী। বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

নব। আমি বাঙ্গালী; আপনিও ত বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন, আপনি তবে কোন্ দেশীয়?

যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "অভাগিনী বাঙ্গালী নহে; পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানী।" নবকুমার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পরিচ্ছদ

পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানীর ন্যায় বটে। কিন্তু বাঙ্গালা ত ঠিক বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন,

"মহাশয়, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন;—আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায়?"

নবকুমার কহিলেন, "আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।"

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া, প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?"

নবকুমার বলিলেন, "নবকুমার শর্ম্মা।"

প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

সুন্দরীসন্দর্শনে

"————ধর দেবি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণ!"

মেঘনাদবধ

নবকুমার গৃহস্বামীকে ডাকিয়া অন্য প্রদীপ আনিতে বলিলেন। অন্য প্রদীপ আনিবার পূর্ব্বে একটী দীর্ঘনিশ্বাসশব্দ শুনিতে পাইলেন। প্রদীপ আনিবার ক্ষণেক পরে ভৃত্যবেশী এক জন মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদেশিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,

"সে কি, তোমাদিগের এত বিলম্ব হইল কেন? আর সকলে কোথায়?"

ভৃত্য কহিল, "বাহকেরা সকল মাতোয়ারা হইয়াছিল, তাহাদের গুছাইয়া আনিতে আমরা পাল্কীর পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। পরে ভগ্নশিবিকা দেখিয়া এবং আপনাকে না দেখিয়া আমরা একেবারে অজ্ঞান হইয়াছিলাম। কেহ কেহ সেই স্থানে আছে; কেহ কেহ অন্যান্য দিকে আপনার সন্ধানে গিয়াছে। আমি এদিকে সন্ধানে আসিয়াছি।"

মতি কহিলেন, "তাহাদিগকে লইয়া আইস।"

নফর সেলাম করিয়া চলিয়া গেল, বিদেশিনী কিয়ৎকাল করলগ্নকপোলা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নবকুমার বিদায় চাহিলেন। তখন মতি স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় অবস্থিতি করিবেন?"

নব। ইহারই পরের ঘরে।

মতি। আপনার সে ঘরের কাছে একখানি পাল্কী দেখিলাম, আপনার কি কেহ সঙ্গী আছেন?

"আমার স্ত্রী সঙ্গে।"

মতিবিবি আবার ব্যঙ্গের অবকাশ পাইলেন। কহিলেন, "তিনিই কি অদ্বিতীয়া রূপসী?"

নব। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

মতি। দেখা কি পাওয়া যায়?

নব। (চিন্তা করিয়া) ক্ষতি কি?

মতি। তবে একটু অনুগ্রহ করুন। অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। আগরা গিয়া বলিতে চাহি, কিন্তু এখনই নহে—আপনি এখন যান। ক্ষণেক পরে আমি আপনাকে সংবাদ দিব।

নবকুমার চলিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে অনেক লোক জন, দাস দাসী ও বাহক সিন্দুক ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল। একখানি শিবিকাও আসিল; তাহাতে এক জন দাসী। পরে নবকুমারের নিকট সংবাদ আসিল, "বিবি স্মরণ করিয়াছেন।"

নবকুমার মতিবিবির নিকট পুনরাগমন করিলেন। দেখিলেন, এবার আবার রূপান্তর। মতিবিবি, পূর্ব্বপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সুবর্ণমুক্তাদিশোভিত কারুকার্য্যযুক্ত বেশভূষা ধারণ করিয়াছেন; নিরলঙ্কার দেহ অলঙ্কারে খচিত করিয়াছেন। যেখানে যাহা ধরে—কুন্তলে, কবরীতে, কপালে, নয়নপার্শ্বে, কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুযুগে, সর্ব্বত্র সুবর্ণমধ্য

হইতে হীরকাদি রত্ন ঝলসিতেছে। নবকুমারের চক্ষু অস্থির হইল। প্রভূতনক্ষত্রমালা-ভূষিত আকাশের ন্যায়—মধুরায়ত শরীর সহিত অলঙ্কারবাহুল্য সুসঙ্গত বোধ হইল, এবং তাহাতে আরও সৌন্দর্য্যপ্রভা বর্দ্ধিত হইল। মতিবিবি নবকুমারকে কহিলেন,

"মহাশয়, চলুন, আপনার পত্নীর নিকট পরিচিত হইয়া আসি।" নবকুমার বলিলেন, "সে জন্য অলঙ্কার পরিবার প্রয়োজন ছিল না। আমার পরিবারের কোন গহনাই নাই।"

মতিবিবি। গহনাগুলি না হয়, দেখাইবার জন্য পরিয়াছি। স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে, সে না দেখাইলে বাঁচে না। এখন, চলুন।

নবকুমার মতিবিবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। যে দাসী শিবিকারোহণে আসিয়াছিল, সেও সঙ্গে চলিল। ইহার নাম পেষমন্।

কপালকুণ্ডলা দোকানঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়া ছিলেন। একটী ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল। মতিবিবি প্রথম যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন অধরপার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটী তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন সে হাসি-হাসি ভাব দূর হইল; মতির মুখ গম্ভীর হইল;—অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহেন না;—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।

ক্ষণেক পরে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন। মতি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন, "ও কি হইতেছে?" মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।

অলঙ্কারসমাবেশ সমাপ্ত হইলে, মতি নবকুমারকে কহিলেন, "আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন। এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না। পরিতাপ এই যে, রাজধানীতে এ রূপরাশি দেখাইতে পারিলাম না। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম। আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন।"

নবকুমার চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি! এ যে বহুমূল্য অলঙ্কার। আমি এ সব লইব কেন?"

মতি কহিলেন, "ঈশ্বরপ্রসাদাৎ আমার আর আছে। আমি নিরাভরণা হইব না। ইহাকে পরাইয়া আমার যদি সুখবোধ হয়, আপনি কেন ব্যাঘাত করেন?"

মতিবিবি ইহা কহিয়া দাসীসঙ্গে চলিয়া গেলেন। বিরলে আসিলে পেষমন্ মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল,

"বিবিজান্! এ ব্যক্তি কে?"

যবনবালা উত্তর করিলেন, "মেরা শৌহর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—*—

শিবিকারোহণে

"————খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর কাঞ্চি।"

মেঘনাদবধ

গহনার দশা কি হইল, বলি শুন। মতিবিবি গহনা রাখিবার জন্য একটী রৌপ্যজড়িত হস্তিদন্তের কৌটা পাঠাইয়া দিলেন। দস্যুরা তাঁহার অল্প সামগ্রীই লইয়াছিল—নিকটে যাহা ছিল, তদ্ব্যতীত কিছুই পায় নাই।

নবকুমার দুই একখানি গহনা কপালকুণ্ডলার অঙ্গে রাখিয়া অধিকাংশ কৌটায় তুলিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে মতিবিবি বর্দ্ধমানাভিমুখে, নবকুমার সপত্নীক সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে শিবিকাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে গহনার কৌটা দিলেন। বাহকেরা সহজেই নবকুমারকে পশ্চাৎ করিয়া চলিল। কপালকুণ্ডলা শিবিকাদ্বার খুলিয়া চারি দিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন। এক জন ভিক্ষুক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, ভিক্ষা চাইতে চাইতে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আমার ত কিছু নাই, তোমাকে কি দিব?"

ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার অঙ্গে যে দুই একখানা অলঙ্কার ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা মুক্তা—তোমার কিছুই নাই?"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?"

ভিক্ষুক কিছু বিস্মিত হইল। ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত। ক্ষণমাত্র পরে কহিল, "ছই বই কি?"

কপালকুণ্ডলা অকপটহৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন।

ভিক্ষুক ক্ষণেক বিহ্বল হইয়া রহিল। দাসদাসী কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। ভিক্ষুকের বিহ্বলভাব ক্ষণিকমাত্র। তখনই এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া গহনা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

স্বদেশে

"শয্যাখেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ।
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ॥"

মেঘদূত

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া স্বদেশে উপনীত হইলেন। নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা; তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা; কেন না, তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।

অবস্থান্তরে নবকুমার অজ্ঞাতকুলশীলা তপস্বিনীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনায়, তাঁহার আত্মীয় স্বজন কত দূর সন্তুষ্টিপ্রকাশ করিতেন, তাহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই। সকলেই তাঁহার প্রত্যাগমনপক্ষে নিরাশ্বাস হইয়াছিল। সহযাত্রীরা প্রত্যাগমন করিয়া রটনা করিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন যে, এই সত্যবাদীরা আত্মপ্রতীতি মতই কহিয়াছিলেন;—কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের

কল্পনাশক্তির অবমাননা করা হয়। প্রত্যাগত যাত্রীর মধ্যে অনেকে নিশ্চিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রমুখে পড়িতে তাঁহারা প্রত্যক্ষই দৃষ্টি করিয়াছিলেন।—কখনও কখনও ব্যাঘ্রটার পরিমাণ লইয়া তর্ক বিতর্ক হইল; কেহ বলিলেন, "ব্যাঘ্রটা আট হাত হইবেক—" কেহ কহিলেন, "না, প্রায় চৌদ্দ হাত।" পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীন যাত্রী কহিলেন, "যাহা হউক, আমি বড় রক্ষা পাইয়াছিলাম। ব্যাঘ্রটা আমাকে অগ্রে তাড়া করিয়াছিল, আমি পলাইলাম; নবকুমার তত সাহসী পুরুষ নহে; পলাইতে পারিল না।"

যখন এই সকল রটনা নবকুমারের মাতা প্রভৃতির কর্ণগোচর হইল, তখন পুরমধ্যে এমত ক্রন্দনধ্বনি উঠিল যে, কয় দিন তাহার ক্ষান্তি হইল না। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে নবকুমারের মাতা একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। এমত সময়ে যখন নবকুমার সস্ত্রীক হইয়া বাটী আগমন করিলেন, তখন তাঁহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বধূ কোন্ জাতীয়া বা কাহার কন্যা? সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল। নবকুমারের মাতা মহাসমাদরে বধূ বরণ করিয়া গৃহে লইলেন।

যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল। অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই;—অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণ প্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই; এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্য্যন্তও বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই; পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল; জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে-যেরূপ দুর্দ্দম স্রোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।

এই প্রেমাবির্ভাব সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত; যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; সর্ব্বদা অন্যমনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপেও প্রকাশ পাইত। তাঁহার

প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চাপল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য্য জন্মিল; যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল; নবকুমারের মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল; মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সৎকর্ম্মের জন্য মাত্র সৃষ্টা বোধ হইতে লাগিল; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে!

আর কপালকুণ্ডলা? তাহার কি ভাব! চল পাঠক, তাহাকে দর্শন করি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—*—

অবরোধে

"কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে॥"

কুমারসম্ভব

সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্ব্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল; সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়।

সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলি নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্ত্তুগীসেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্য্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু নগরের অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।

সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না; রাজপথ সকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে একটী ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহটী ইষ্টকরচিত; দেশকাল বিবেচনা করিলে তাহাকে নিতান্ত সামান্য গৃহ বলা যাইতে পারিত না। দোতালা বটে, কিন্তু ভয়ানক উচ্চ নহে; এখন একতালায় সেরূপ উচ্চতা অনেক দেখা যায়।

এই গৃহের ছাদের উপরে দুইটী নবীনবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জন বটে। নিকটে, এক দিকে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্য দিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরের অসংখ্য সৌধমালা, নববসন্তপবনস্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা করিতেছে। অন্য দিকে, অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।

যে নবীনাদ্বয় প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে এক জন চন্দ্ররশ্মিবর্ণাভা; অবিন্যস্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধলুক্কায়িতা। অপরা কৃষ্ণাঙ্গী; তিনি সুমুখী ষোড়শী, তাঁহার ক্ষুদ্র দেহ, মুখখানি ক্ষুদ্র, তাহার উপরার্দ্ধে চারি দিক্ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কুন্তলদাম বেড়িয়া পড়িয়াছে; যেন নীলোৎপলদলরাজি উৎপলমধ্যকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। নয়নযুগল বিস্ফারিত, কোমল-শ্বেতবর্ণ, সফরীসদৃশ; অঙ্গুলিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সঙ্গিনীর কেশতরঙ্গমধ্যে ন্যস্ত হইয়াছে। পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন যে, চন্দ্ররশ্মিবর্ণশোভিনী কপালকুণ্ডলা; তাঁহাকে বলিয়া দিই, কৃষ্ণাঙ্গী, তাঁহার ননন্দা শ্যামাসুন্দরী।

শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃজায়াকে কখনও "বউ", কখনও আদর করিয়া "বন", কখনও "মৃণো" সম্বোধন করিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলা নামটী বিকট বলিয়া, গৃহস্থেরা তাঁহার

নাম মৃণ্ময়ী রাখিয়াছিলেন ; এই জন্যই "মৃণো" সম্বোধন। আমরাও এখন কখন কখন ইঁহাকে মৃণ্ময়ী বলিব।

শ্যামাসুন্দরী একটী শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা—

"বলে—পদ্মরাণি, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥
আবার—বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নামলে ঢল, সাগরেতে যায়॥
ছি ছি—সরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখতে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
মরি—একি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পরপরশে, সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ॥"

"তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকিবি ?"

মৃণ্ময়ী উত্তর করিল, "কেন, কি তপস্যা করিতেছি ?"

শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃণ্ময়ীর কেশতরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল, "তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না ?"

মৃণ্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, "ভাল, আমার সাধটী পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কত দিন যোগিনী থাকিবে ?"

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না ?

শ্যা। কেন ? দেখিবি ? যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান ?

মৃণ্ময়ী কহিলেন, "না।"

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।

মৃ। তাতে কি ?

শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি ?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস্। দেখিবি,

"বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কানে তোর দিব যোড়া দুল॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া,
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোণার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে॥"

মৃণ্ময়ী কহিলেন, "ভাল, বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোণা হলেম। চুল বাঁধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম; খোঁপায় ফুল দিলাম; কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম; কানে দুল দুলিল; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোণার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ?"

শ্যা। বল দেখি ফুলটী ফুটিলে কি সুখ?

মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?

শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল; প্রভাতবাতাহত নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল; বলিলেন, "ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।"

শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "আচ্ছা—তাই যদি না হইল;— তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?"

মৃণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে যে মৃণ্ময়ী উপকৃতা হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন, কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন, "এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?"

মৃ। উপায় নাই।

শ্যা। তবে করিবে কি?

মৃ। অধিকারী কহিতেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল?"

মৃণ্ময়ী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে।"

শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফল কেন?

মৃণ্ময়ী কহিলেন, "শুন। যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি কর্ম্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল; ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না—অতএব কপালে কি আছে জানি না।"

মৃণ্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

—*—

ভুতপূর্ব্বে

"কষ্টোঽয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ।"

রত্নাবলী

যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চটি হইতে যাত্রা করেন, তখন মতিবিবি পথান্তরে বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ মতিবিবি পথবাহন করেন, ততক্ষণ আমরা তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু বলি। মতির চরিত্র মহাদোষ-কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিত। এরূপ চরিত্রের বিস্তারিত বৃত্তান্তে পাঠক মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন না।

যখন ইঁহার পিতা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন, তখন ইঁহার হিন্দু নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া লুৎফ-উন্নিসা নাম হইল। মতিবিবি কোন কালেও ইঁহার নাম নহে। তবে কখনও কখনও ছদ্মবেশে দেশবিদেশ ভ্রমণকালে ঐ নাম গ্রহণ করিতেন। ইঁহার পিতা ঢাকায় আসিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তথায় অনেক নিজদেশীয় লোকের সমাগম। দেশীয় সমাজে সমাজচ্যুত হইয়া সকলের থাকিতে ভাল লাগে না। অতএব তিনি কিছু দিনে সুবাদারের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া তাঁহার সুহৃদ্ অনেকানেক ওমরাহের নিকট পত্রসংগ্রহপূর্ব্বক সপরিবারে আগ্রায় আসিলেন। আকবরশাহের নিকট কাহারও গুণ অবিদিত থাকিত না; শীঘ্রই তিনি ইঁহার গুণগ্রহণ করিলেন। লুৎফ-উন্নিসার পিতা শীঘ্রই উচ্চপদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমরাহ মধ্যে গণ্য হইলেন। এদিকে লুৎফ-উন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। রাজধানীর অসংখ্য

রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। লুৎফ-উন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দ্দমবেগবতী। ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এ কার্য্য সৎ, এ কার্য্য অসৎ, এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতেন। যখন সৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম্ম করিতেন; যখন অসৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম্ম করিতেন; যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দ্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফ-উন্নিসাসম্বন্ধে জন্মিল। তাঁহার পূর্ব্বস্বামী বর্ত্তমান,—ওমরাহেরা কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনিও বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? প্রথমে কাণাকাণি, শেষে কালিমাময় কলঙ্ক রটিল। তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা গোপনে যাহাদিগকে কৃপা বিতরণ করিতেন, তন্মধ্যে যুবরাজ সেলিম এক জন। এক জন ওমরাহের কুলকলঙ্ক জন্মাইলে, পাছে আপন অপক্ষপাতী পিতার কোপানলে পড়িতে হয়, সেই আশঙ্কায় সেলিম এ পর্য্যন্ত লুৎফ-উন্নিসাকে আপন অবরোধবাসিনী করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সুযোগ পাইলেন। রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী, যুবরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। যুবরাজ লুৎফ-উন্নিসাকে তাঁহার প্রধানা সহচরী করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইলেন।

লুৎফ-উন্নিসার ন্যায় বুদ্ধিমতী মহিলা যে অল্প দিনেই রাজকুমারের হৃদয়াধিকার করিবেন, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সেলিমের চিত্তে তাঁহার প্রভুত্ব এরূপ প্রতিযোগিশূন্য হইয়া উঠিল যে, লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী হইবেন, ইহা তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা হইল। কেবল লুৎফ-উন্নিসার স্থিরপ্রতিজ্ঞা হইল, এমত নহে; রাজপুরবাসী সকলেরই উহা সম্ভব বোধ হইল। এইরূপ আশার স্বপ্নে লুৎফ-উন্নিসা জীবন বাহিত করিতেছিলেন, এমত সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আকবরশাহের কোষাধ্যক্ষ (আকৃতিমাদ-উদ্দৌলা) খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবনকুলে প্রধানা সুন্দরী। এক দিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। সেই দিন মেহের-উন্নিসার সহিত সেলিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেই দিন

সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শের আফগান নামক এক জন মহাবিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। সেলিম অনুরাগান্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট যাচমান হইলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। সুতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইল। আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল। কিন্তু সেলিমের চিত্তবৃত্তি সকল লুৎফ-উন্নিসার নখদর্পণে ছিল;—তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, শের আফগানের সহস্র প্রাণ থাকিলেও তাঁহার নিস্তার নাই, আকবরশাহের মৃত্যু হইলেই তাহার প্রাণান্ত হইবে—মেহের-উন্নিসা সেলিমের মহিষী হইবেন। লুৎফ-উন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিলেন।

মহম্মদীয় সম্রাট্-কুলগৌরব আকবরের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। যে প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রভায় তুরকী হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সে সূর্য্য অস্তগামী হইল। এ সময়ে লুৎফ-উন্নিসা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এক দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিলেন।

রাজপুতপতি রাজা মানসিংহের ভগিনী সেলিমের প্রধানা মহিষী। খস্রু তাঁহার পুত্র। এক দিন তাঁহার সহিত আকবরশাহের পীড়িত শরীর সম্বন্ধে লুৎফ-উন্নিসার কথোপকথন হইতেছিল; রাজপুতকন্যা এক্ষণে বাদশাহপত্নী হইবেন, এই কথার প্রসঙ্গ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছিলেন, প্রত্যুত্তরে খস্রুর জননী কহিলেন, "বাদশাহের মহিষী হইলে মনুষ্যজন্ম সার্থক বটে, কিন্তু যে বাদশাহ-জননী, সেই সর্ব্বোপরি।" উত্তর শুনিবামাত্র এক অপূর্ব্বচিন্তিত অভিসন্ধি লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে উদয় হইল। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাহাই হউক না কেন? সেও ত আপনার ইচ্ছাধীন।" বেগম কহিলেন, "সে কি?" চতুরা উত্তর করিলেন, "যুবরাজপুত্র খস্রুকে সিংহাসন দান করুন।"

বেগম কোন উত্তর করিলেন না। সে দিন এ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হইল না, কিন্তু কেহই এ কথা ভুলিলেন না। স্বামীর পরিবর্ত্তে পুত্র যে সিংহাসনারোহণ করেন, ইহা বেগমের অনভিমত নহে; মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফ-উন্নিসার যেরূপ হৃদয়শেল, বেগমেরও সেইরূপ। মানসিংহের ভগিনী আধুনিক তুর্কমান কন্যার যে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবেন, তাহা ভাল লাগিবে কেন? লুৎফ-উন্নিসারও এ সঙ্কল্পে উদ্যোগিনী হইবার গাঢ় তাৎপর্য্য ছিল। অন্য দিন পুনর্ব্বার এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। উভয়ের মত স্থির হইল।

সেলিমকে ত্যাগ করিয়া খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা অসম্ভাবনীয় বোধ হইবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা লুৎফ-উন্নিসা, বেগমের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করাইলেন। তিনি কহিলেন, "মোগলের সাম্রাজ্য রাজপুতের বাহুবলে স্থাপিত রহিয়াছে; সেই রাজপুত জাতির চূড়া রাজা মানসিংহ, তিনি খস্রুর মাতুল; আর মুসলমানদিগের প্রধান খাঁ আজিম, তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী, তিনি খস্রুর শ্বশুর; ইঁহারা দুই জনে উদ্যোগী হইলে, কে ইঁহাদিগের অনুবর্ত্তী না হইবে? আর কাহার বলেই বা যুবরাজ সিংহাসন গ্রহণ করিবেন? রাজা মানসিংহকে এ কার্য্যে ব্রতী করা, আপনার ভার। খাঁ আজিম ও অন্যান্য মহম্মদীয় ওমরাহগণকে লিপ্ত করা আমার ভার। আপনার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইব, কিন্তু এক আশঙ্কা, পাছে সিংহাসন আরোহণ করিয়া খস্রু এ দুশ্চারিণীকে পুরবহিষ্কৃত করিয়া দেন।"

বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আগ্রার যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। তোমার স্বামী পঞ্চ হাজারি মন্সবদার হইবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যদি রাজপুরীমধ্যে সামান্যা পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে হইল, তবে প্রতিপুষ্পবিহারিণী মধুকরীর পক্ষচ্ছেদন করিয়া কি সুখ হইল? যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইল, তবে বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার দাসীত্বে কি সুখ? তাহার অপেক্ষা কোন প্রধান রাজপুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়।

শুধু এই লোভে লুৎফ-উন্নিসা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহার প্রতিশোধও তাঁহার উদ্দেশ্য।

খাঁ আজিম প্রভৃতি আগ্রা দিল্লীর ওমরাহেরা লুৎফ-উন্নিসার বিলক্ষণ বাধ্য ছিলেন। খাঁ আজিম যে জামাতার ইষ্টসাধনে উদ্যুক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তিনি এবং আর আর ওমরাহগণ সম্মত হইলেন। খাঁ আজিম লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন, "মনে কর, যদি কোন অসুযোগে আমরা কৃতকার্য্য না হই, তবে তোমার আমার রক্ষা নাই। অতএব প্রাণ বাঁচাইবার একটা পথ রাখা ভাল।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপনার কি পরামর্শ?" খাঁ আজিম কহিলেন, "উড়িষ্যা ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই। কেবল সেই স্থানে মোগলের শাসন তত প্রখর নহে। উড়িষ্যায় সৈন্য আমাদিগের হস্তগত থাকা আবশ্যক। তোমার ভ্রাতা উড়িষ্যায় মন্সবদার আছেন;

আমি কল্য প্রচার করিব, তিনি যুদ্ধে আহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিবার ছলে কল্যই উড়িষ্যায় যাত্রা কর। তথায় যৎকর্ত্তব্য, তাহা সাধন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর।"

লুৎফ-উন্নিসা এ পরামর্শে সম্মত হইলেন। তিনি উড়িষ্যায় আসিয়া যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

পথান্তরে

"যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধ'রে।
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে॥
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফল হলো, হতে পারে কাল॥"

নবীন তপস্বিনী

যে দিন নবকুমারকে বিদায় করিয়া মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সে দিন তিনি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। অন্য চটিতে রহিলেন। সন্ধ্যার সময়ে পেষমনের সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতেছিল, এমত কালে মতি সহসা পেষমন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"পেষমন্! আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?"

পেষমন্ কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেমন আর দেখিব?" মতি কহিলেন, "সুন্দর পুরুষ বটে কি না?"

নবকুমারের প্রতি পেষমনের বিশেষ বিরাগ জন্মিয়াছিল। যে অলঙ্কারগুলি মতি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিলেন, তৎপ্রতি পেষমনের বিশেষ লোভ ছিল; মনে মনে ভরসা ছিল, এক দিন চাহিয়া লইবেন। সেই আশা নির্ম্মূল হইয়াছিল, সুতরাং কপালকুণ্ডলা এবং তাঁহার স্বামী, উভয়ের প্রতি তাঁহার দারুণ বিরক্তি। অতএব স্বামিনীর প্রশ্নে উত্তর করিলেন,

"দরিদ্র ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিত কি ?"

সহচরীর মনের ভাব বুঝিয়া মতি হাস্য করিয়া কহিলেন, "দরিদ্র ব্রাহ্মণ যদি ওমরাহ হয়, তবে সুন্দর পুরুষ হইবে কি না ?"

পে। সে আবার কি ?

মতি। কেন, তুমি জান না যে, বেগম স্বীকার করিয়াছেন যে, খস্রু বাদশাহ হইলে আমার স্বামী ওমরাহ হইবে ?

পে। তা ত জানি। কিন্তু তোমার পূর্ব্বস্বামী ওমরাহ হইবেন কেন ?

মতি। তবে আমার আর কোন্ স্বামী আছে ?

পে। যিনি নূতন হইবেন।

মতি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার ন্যায় সতীর দুই স্বামী, বড় অন্যায় কথা· ও কে যাইতেছে ?"

যাহাকে দেখিয়া মতি কহিলেন, "ও কে যাইতেছে ?" পেষমন্ তাহাকে চিনিল ; সে আগ্রানিবাসী, খাঁ আজিমের আশ্রিত ব্যক্তি। উভয়ে ব্যস্ত হইলেন। পেষমন্ তাহাকে ডাকিলেন। সে ব্যক্তি আসিয়া লুৎফ-উন্নিসাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একখানি পত্র দান করিল ; কহিল,

"পত্র লইয়া উড়িষ্যা যাইতেছিলাম। পত্র জরুরি।"

পত্র পড়িয়া মতিবিবির আশা ভরসা সকল অন্তর্হিত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই,

"আমাদিগের যত্ন বিফল হইয়াছে। মৃত্যুকালেও আকবরশাহ আপন বুদ্ধিবলে আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকে গতি হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাবলে, কুমার সেলিম এক্ষণে জাহাঁগীর শাহ হইয়াছেন। তুমি খস্রুর জন্য ব্যস্ত হইবে না। এই উপলক্ষে কেহ তোমার শত্রুতা সাধিতে না পারে, এমত চেষ্টার জন্য তুমি শীঘ্র আগ্রায় ফিরিয়া আসিবে।"

আকবরশাহ যে প্রকারে এ ষড়্‌যন্ত্র নিষ্ফল করেন, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে ; এ স্থলে সে বিবরণের আবশ্যকতা নাই।

পুরস্কারপূর্ব্বক দূতকে বিদায় করিয়া, মতি পেষমন্‌কে পত্র শুনাইলেন। পেষমন্ কহিল,

"এক্ষণে উপায় ?"

মতি। এখন আর উপায় নাই।

পে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ভাল, ক্ষতিই কি ? যেমন ছিলে, তেমনই থাকিবে, মোগল বাদশাহের পুরস্ত্রীমাত্রই অন্য রাজ্যের পাটরাণী অপেক্ষাও বড়।

মতি। (ঈষৎ হাসিয়া) তাহা আর হয় না। আর সে রাজপুরে থাকিতে পারিব না। শীঘ্রই মেহের-উন্নিসার সহিত জাহাঁগীরের বিবাহ হইবে। মেহের-উন্নিসাকে আমি কিশোর বয়োবধি ভাল জানি; একবার সে পুরবাসিনী হইলে সেই বাদশাহ হইবে, জাহাঁগীর বাদশাহ নামমাত্র থাকিবে। আমি যে তাহার সিংহাসনারোহণের পথরোধের চেষ্টা পাইয়াছিলাম, ইহা তাহার অবিদিত থাকিবে না। তখন আমার দশা কি হইবে ?

পেষমন্ প্রায় রোদনোন্মুখী হইয়া কহিল, "তবে কি হইবে ?"

মতি কহিলেন, "এক ভরসা আছে। মেহের-উন্নিসার চিত্ত জাহাঁগীরের প্রতি কিরূপ ? তাহার যেরূপ দার্ঢ্য, তাহাতে যদি সে জাহাঁগীরের প্রতি স্বামীর প্রতি যথার্থ [illegible] অনুরাগিণী না হইয়া [illegible] স্নেহশালিনী হইয়া থাকে, তবে জাহাঁগীর শত শের আফগান বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অভিলাষিণী হয়, তবে আর কোন ভরসা নাই।"

পে। মেহের-উন্নিসার মন কি প্রকারে জানিবে ?

মতি হাসিয়া কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসার অসাধ্য কি ? মেহের-উন্নিসা আমার বাল্যসখী,—কালি বর্দ্ধমানে গিয়া তাহার নিকট দুই দিন অবস্থিতি করিব।"

পে। যদি মেহের-উন্নিসা বাদশাহের অনুরাগিণী হন, তাহা হইলে কি করিবে ?

ম। পিতা কহিয়া থাকেন, "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।"

উভয়ে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। ঈষৎ হাসিতে মতির ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। পেষমন্ জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিতেছ কেন ?"

মতি কহিলেন, "কোন নূতন ভাব উদয় হইতেছে।"

পে। কি নূতন ভাব ?

মতি তাহা পেষমন্‌কে বলিলেন না। আমরাও তাহা পাঠককে বলিব না। পশ্চাৎ প্রকাশ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

প্রতিযোগিনী-গৃহে

"শ্যামাদন্যো নহি নহি নহি প্রাণনাথো মমা ।"

উদ্ধবদূত

এ সময়ে শের আফগান বঙ্গদেশের সুবাদারের অধীনে বর্দ্ধমানের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

মতিবিবি বর্দ্ধমানে আসিয়া শের আফগানের আলয়ে উপনীত হইলেন। শের আফগান সপরিবারে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে তথায় অবস্থিতি করাইলেন। যখন শের আফগান এবং তাঁহার স্ত্রী মেহের-উন্নিসা আগ্রায় অবস্থিতি করিতেন, তখন মতি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। মেহের-উন্নিসার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। পরে উভয়েই দিল্লীর সাম্রাজ্যলাভের জন্য প্রতিযোগিনী হইয়াছিলেন। এক্ষণে একত্র হওয়ায় মেহের-উন্নিসা মনে ভাবিতেছেন, "ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব কাহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়াছেন? বিধাতাই জানেন, আর সেলিম জানেন, আর কেহ যদি জানে ত সে এই লুৎফ-উন্নিসা; দেখি, লুৎফ-উন্নিসা কি কিছু প্রকাশ করিবে না?" মতিবিবিরও মেহের-উন্নিসার মন জানিবার চেষ্টা।

মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধানা রূপবতী এবং গুণবতী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৌন্দর্য্যে ইতিহাসকীর্ত্তিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিদ্যায় তাৎকালিক পুরুষদিগের মধ্যে বড় অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্য গীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া; কবিতা-রচনায় বা চিত্রলিখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সরস কথা, তাঁহার সৌন্দর্য্য

অপেক্ষাও মোহময়ী ছিল। মতিও এ সকল গুণে হীনা ছিলেন না। অন্ত এই দুই চমৎকারিণী পরস্পরের মন জানিতে উৎসুক হইলেন।

মেহের-উন্নিসা খাস কামরায় বসিয়া তসবীর লিখিতেছিলেন। মতি মেহের-উন্নিসার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্রলিখন দেখিতেছিলেন, এবং তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। মেহের-উন্নিসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্র কেমন হইতেছে?" মতিবিবি উত্তর করিলেন, "তোমার চিত্র যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে। অন্য কেহ যে তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নহে, ইহাই দুঃখের বিষয়।"

মেহে। তাই যদি সত্য হয় ত দুঃখের বিষয় কেন?

ম। অন্যের তোমার মত চিত্র-নৈপুণ্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত।

মেহে। কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।

মেহের-উন্নিসা এই কথা কিছু গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন।

ম। ভগিনি! আজ মনের স্ফূর্ত্তির এত অল্পতা কেন?

মেহে। স্ফূর্ত্তির অল্পতা কই? তবে যে তুমি আমাকে কাল প্রাতে ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাই বা কি প্রকারে ভুলিব? আর দুই দিন থাকিয়া তুমি কেনই বা চরিতার্থ না করিবে?

ম। সুখে কার অসাধ? সাধ্য হইলে আমি কেন যাইব? কিন্তু আমি পরের অধীন; কি প্রকারে থাকিব?

মেহে। আমার প্রতি তোমার ত ভালবাসা আর নাই, থাকিলে তুমি কোন মতে রহিয়া যাইতে। আসিয়াছ ত রহিতে পার না কেন?

ম। আমি ত সকল কথাই বলিয়াছি। আমার সহোদর মোগলসৈন্যে মন্সবদার—তিনি উড়িষ্যার পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন। আমি তাঁহারই বিপৎসংবাদ পাইয়া বেগমের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। উড়িষ্যায় অনেক বিলম্ব করিয়াছি, এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তোমার সহিত অনেক দিন দেখা হয় নাই, এই জন্য দুই দিন রহিয়া গেলাম।

মেহে। বেগমের নিকট কোন্ দিন পৌঁছিবার কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছ?

মতি বুঝিলেন, মেহের-উন্নিসা ব্যঙ্গ করিতেছেন। মার্জ্জিত অথচ মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গে মেহের-উন্নিসা যেরূপ নিপুণ, মতি সেরূপ নহেন। কিন্তু অপ্রতিভ হইবার লোকও

নহেন। তিনি উত্তর করিলেন, "দিন নিশ্চিত করিয়া তিন মাসের পথ যাতায়াত করা কি সম্ভবে? কিন্তু অনেক কাল বিলম্ব করিয়াছি; আরও বিলম্বে অসন্তোষের কারণ জন্মিতে পারে।"

মেহের-উন্নিসা নিজ ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কাহার অসন্তোষের আশঙ্কা করিতেছ? যুবরাজের, না তাঁহার মহিষীর?"

মতি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "এ লজ্জাহীনাকে কেন লজ্জা দিতে চাও? উভয়েরই অসন্তোষ হইতে পারে।"

মে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—তুমি স্বয়ং বেগম নাম ধারণ করিতেছ না কেন? শুনিয়াছিলাম, কুমার সেলিম তোমাকে বিবাহ করিয়া খাসবেগম করিবেন; তাহার কত দূর?

ম। আমি ত সহজেই পরাধীনা। যে কিছু স্বাধীনতা আছে, তাহা কেন নষ্ট করিব? বেগমের সহচারিণী বলিয়া অনায়াসে উড়িষ্যায় আসিতে পারিলাম, সেলিমের বেগম হইলে কি উড়িষ্যায় আসিতে পারিতাম?

মে। যে দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হইবে, তাহার উড়িষ্যায় আসিবার প্রয়োজন?

ম। সেলিমের প্রধানা মহিষী হইব, এমন স্পর্দ্ধা কখনও করি না। এ হিন্দুস্থান দেশে কেবল মেহের-উন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত।

মেহের-উন্নিসা মুখ নত করিলেন। ক্ষণেক নিরুত্তর থাকিয়া কহিলেন, "ভগিনি! আমি এমত মনে করি না যে, তুমি আমাকে পীড়া দিবার জন্য এ কথা বলিলে, কি আমার মন জানিবার জন্য বলিলে। কিন্তু তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি যে শের আফগানের বনিতা, আমি যে কায়মনোবাক্যে শের আফগানের দাসী, তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া কথা কহিও না।"

লজ্জাহীনা মতি এ তিরস্কারে অপ্রতিভ হইলেন না; বরং আরও সুযোগ পাইলেন। কহিলেন, "তুমি যে পতিগতপ্রাণা, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সেই জন্যই ছলক্রমে এ কথা তোমার সম্মুখে পাড়িতে সাহস করিয়াছি। সেলিম যে এ পর্য্যন্ত তোমার সৌন্দর্য্যের মোহ ভুলিতে পারেন নাই, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। সাবধান থাকিও।"

মে। এখন বুঝিলাম। কিন্তু কিসের আশঙ্কা?

মতি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "বৈধব্যের আশঙ্কা।"

এই কথা বলিয়া মতি মেহের-উন্নিসার মুখপানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভয় বা আহ্লাদের কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাইলেন না। মেহের-উন্নিসা সদর্পে কহিলেন,

"বৈধব্যের আশঙ্কা! শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহে। বিশেষ আকবর বাদশাহের রাজ্যমধ্যে তাঁহার পুত্রও বিনাদোষে পরপ্রাণ নষ্ট করিয়া নিস্তার পাইবেন না।"

ম। সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে, আকবরশাহ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরকে কে দমন করিবে?

মেহের-উন্নিসা আর কিছু শুনিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবার মুখ নত করিলেন, লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ কেন?"

মেহের-উন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?"

মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন, "তুমি আজিও যুবরাজকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পার নাই?"

মেহের-উন্নিসা গদগদস্বরে কহিলেন, "কাহাকে বিস্মৃত হইব? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু শুন, ভগিনি! অকস্মাৎ মনের কবাট খুলিল; তুমি এ কথা শুনিলে; কিন্তু আমার শপথ, এ কথা যেন কর্ণান্তরে না যায়।"

মতি কহিল, "ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু যখন সেলিম শুনিবেন যে, আমি বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলাম, তখন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবেন যে, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল? তখন আমি কি উত্তর করিব?"

মেহের-উন্নিসা কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "এই কহিও যে, মেহের-উন্নিসা হৃদয়মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিবে। কিন্তু কখনও আপন কুলমান সমর্পণ করিবে না। দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখনও দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামিহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক না।"

ইহা কহিয়া মেহের-উন্নিসা সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। মতিবিবি চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। কিন্তু মতিবিবিরই জয় হইল। মেহের-উন্নিসার চিত্তের ভাব মতিবিবি

জানিলেন ; মতিবিবির আশা ভরসা মেহের-উন্নিসা কিছুই জানিতে পারিলেন না। যিনি পরে আত্মবুদ্ধিপ্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও মতির নিকট পরাজিতা হইলেন। ইহার কারণ, মেহের-উন্নিসা প্রণয়শালিনী ; মতিবিবি এ স্থলে কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণা।

মনুষ্যহৃদয়ের বিচিত্র গতি মতিবিবি বিলক্ষণ বুঝিতেন। মেহের-উন্নিসার কথা আলোচনা করিয়া তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, কালে তাহাই যথার্থীভূত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অনুরাগিণী ; অতএব নারীদর্পে এখন যাহাই বলুন, পথ মুক্ত হইলে মনের গতি রোধ করিতে পারিবেন না। বাদশাহের মনস্কামনা অবশ্য সিদ্ধ করিবেন।

এ সিদ্ধান্তে মতির আশা ভরসা সকলই নির্মূল হইল। কিন্তু তাহাতে কি মতি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্তপ্রসাদ জন্মিল, তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজনিকেতনে

"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।"

বীরাঙ্গনা কাব্য

মতি আগ্রায় উপনীতা হইলেন। আর তাঁহাকে মতি বলিবার আবশ্যক করে না। কয় দিনে তাঁহার চিত্তবৃত্তিসকল একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

জাহাঁগীরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। জাহাঁগীর তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সমাদর করিয়া, তাঁহার সহোদরের সংবাদ ও পথের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা যাহা মেহের-উন্নিসাকে বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইল। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর বর্দ্ধমানের কথা শুনিয়া, জাহাঁগীর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মেহের-উন্নিসার নিকট দুই দিন ছিলে বলিতেছ, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল ?" লুৎফ-উন্নিসা অকপটহৃদয়ে মেহের-উন্নিসার অনুরাগের পরিচয় দিলেন। বাদশাহ শুনিয়া নীরবে রহিলেন ; তাঁহার বিস্ফারিত লোচনে দুই এক বিন্দু অশ্রু বহিল।

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "জাহাঁপনা ! দাসী শুভ সংবাদ দিয়াছে। দাসীর এখনও কোন পুরস্কারের আদেশ হয় নাই।"

বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন, "বিবি ! তোমার আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত।"

লু। জাহাঁপনা ! দাসীর কি দোষ ?

বাদ। দিল্লীর বাদশাহকে তোমার গোলাম করিয়া দিয়াছি ; আরও পুরস্কার চাহিতেছ ?

লুৎফ-উন্নিসা হাসিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের অনেক সাধ।"

বাদ। আবার কি সাধ হইয়াছে ?

লু। আগে রাজাজ্ঞা হউক যে, দাসীর আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

বাদ। যদি রাজকার্য্যের বিঘ্ন না হয়।

লু। (হাসিয়া) একের জন্য দিল্লীশ্বরের কার্য্যের বিঘ্ন হয় না।

বাদ। তবে স্বীকৃত হইলাম ;—সাধটী কি শুনি।

লু। সাধ হইয়াছে একটী বিবাহ করিব।

জাহাঁগীর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ নূতনতর সাধ বটে। কোথাও সম্বন্ধের স্থিরতা হইয়াছে ?"

লু। তা হইয়াছে। কেবল রাজাজ্ঞার অপেক্ষা। রাজার সম্মতি প্রকাশ না হইলে কোন সম্বন্ধ স্থির নহে।

বাদ। আমার সম্মতির প্রয়োজন কি ? কাহাকে এ সুখের সাগরে ভাসাইবে অভিপ্রায় করিয়াছ ?

লু। দাসী দিল্লীশ্বরের সেবা করিয়াছে বলিয়া দ্বিচারিণী নহে। দাসী আপন স্বামীকেই বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিতেছে।

বাদ। বটে ! এ পুরাতন নফরের দশা কি করিবে ?

লু। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসাকে দিয়া যাইব।

বাদ। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসা কে ?

লু। যিনি হইবেন।

জাহাঁগীর মনে ভাবিলেন যে, মেহের-উন্নিসা যে দিল্লীশ্বরী হইবেন, তাহা লুৎফ-উন্নিসা ধ্রুব জানিয়াছেন। তৎকারণে নিজ মনোভিলাষ বিফল হইল বলিয়া রাজাবরোধ হইতে বিরাগে অবসর হইতে চাহিতেছেন।

এইরূপ বুঝিয়া জাহাঁগীর দুঃখিত হইয়া নীরবে রহিলেন। লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "মহারাজের কি এ সম্বন্ধে সম্মতি নাই ?"

বাদ। আমার অসম্মতি নাই। কিন্তু স্বামীর সহিত আবার বিবাহের আবশ্যকতা কি?

লু। কপালক্রমে প্রথম বিবাহে স্বামী পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এক্ষণে জাহাঁপনার দাসীকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

বাদশাহ রহস্যে হাস্য করিয়া পরে গম্ভীর হইলেন। কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তোমার যদি সেই প্রবৃত্তি হয়, তবে তদ্রূপই কর। কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য্য উভয়েই বিরাজ করেন না? এক বৃন্তে কি দুটী ফুল ফুটে না!"

লুৎফ-উন্নিসা বিস্ফারিতচক্ষে বাদশাহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে, কিন্তু এক মৃণালে দুইটী কমল ফুটে না। আপনার রত্নসিংহাসনতলে কেন কণ্টক হইয়া থাকিব?"

লুৎফ-উন্নিসা আত্মমন্দিরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এইরূপ মনোবাঞ্ছা যে কেন জন্মিল, তাহা তিনি জাহাঁগীরের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। অনুভবে যেরূপ বুঝা যাইতে পারে, জাহাঁগীর সেইরূপ বুঝিয়া ক্ষান্ত হইলেন। নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিলেন না। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখন তাঁহার মনঃ মুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আত্মমন্দিরে

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক॥"

বিদ্যাপতি

লুৎফ-উন্নিসা আলয়ে আসিয়া প্রফুল্লবদনে পেষমন্‌কে ডাকিয়া বেশভূষা পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণ-মুক্তাদি-খচিত বসন পরিত্যাগ করিয়া পেষমন্‌কে কহিলেন যে, "এই পোষাকটী তুমি লও।"

শুনিয়া পেষমন্ কিছু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পোষাকটী বহুমূল্যে সম্প্রতিমাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কহিলেন, "পোষাক আমায় কেন? আজিকার কি সংবাদ?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "শুভ সংবাদ বটে।"

পে। তা ত বুঝিতে পারিতেছি। মেহের-উন্নিসার ভয় কি ঘুচিয়াছে?

লু। ঘুচিয়াছে। এক্ষণে সে বিষয়ের কোন চিন্তা নাই।

পেষমন্ অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তবে এক্ষণে বেগমের দাসী হইলাম।"

লু। যদি তুমি বেগমের দাসী হইতে চাও, তবে আমি মেহের-উন্নিসাকে বলিয়া দিব।

পে। সে কি? আপনি কহিতেছেন যে, মেহের-উন্নিসার বাদশাহের বেগম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

লু। আমি এমত কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই।

পে। চিন্তা নাই কেন? আপনি আগ্রায় একমাত্র অধীশ্বরী না হইলে যে সকলই বৃথা হইল।

Cooch Be

লু। আগ্রার সহিত সম্পর্ক রাখিব না।

পে। সে কি? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার শুভ সংবাদটা তবে কি, বুঝাইয়াই বলুন।

লু। শুভ সংবাদ এই যে, আমি এ জীবনের মত আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম।

পে। কোথায় যাইবেন?

লু। বাঙ্গালায় গিয়া বাস করিব। পারি যদি, কোন ভদ্র লোকের গৃহিণী হইব।

পে। এরূপ ব্যঙ্গ নূতন বটে, কিন্তু শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

লু। ব্যঙ্গ করিতেছি না। আমি সত্য সত্যই আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম। বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি।

পে। এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার জন্মিল?

লু। কুপ্রবৃত্তি নহে। অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফললাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তি জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশে এত দূর করিলাম, তাহার কোন্‌টাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, সকলই ত প্রচুরপরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আজি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্তজন্যও কখনও সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ্, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্য? এ সকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন এক দিনের তরেও সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায়,—প্রথমে নির্ম্মল, ক্ষীণ ধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না; আপনা আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায়, তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয়; কখনও আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকত চর—মরুভূমি নদীহৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায়, কে বলিবে?

পে। আমি ইহার ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ সবে তোমার সুখ হয় না কেন ?

লু। কেন হয় না, তা এত দিনে বুঝিয়াছি। তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছি।

পে। কি বুঝিয়াছ ?

লু। আমি এত কাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত ; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।

পে। এও ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

লু। আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকে ভালবাসিয়াছি ?

পে। (চুপি চুপি) কাহাকেও না।

লু। তবে পাষাণী নই ত কি ?

পে। তা এখন যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন ?

লু। মানস ত বটে। সেই জন্য আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

পে। তারই বা প্রয়োজন কি ? আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে ? এখন যিনি তোমাকে ভালবাসেন, তাঁহাকেই কেন ভালবাস না ? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, যাহাতে বল, দিল্লীর বাদশাহের বড় পৃথিবীতে কে আছে ?

লু। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে জল অধোগামী কেন ?

পে। কেন ?

লু। ললাটলিখন।

লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—*—

চরণতলে

"কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে।
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে॥"

বীরাঙ্গনা কাব্য

ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে ারে না—কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপণকারী যথায় াকুন না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তক উন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটী ঙ্গুলিপরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে ক্ষটী অর্দ্ধ হস্ত, এক হস্ত, দুই হস্তপরিমিত হইল; তথাপি, যদি তাহাতে কাহারও ার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায়, মাস ায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু প ে। আর অমনোযোগের কথা নাই,—ক্রমে ক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে,—চাহি কি, ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।

লুৎফ-উন্নিসার প্রণয় এইরূপ বাড়িয়াছিল। প্রথম এক দিন অকস্মাৎ প্রণয়ভাজনের হিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রণয়সঞ্চার বিশেষ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তখনই অঙ্কুর য়া রহিল। তাহার পর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ সেই ামণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক কতক সুখকর লয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে অঙ্কুর জন্মিল। মূর্ত্তিপ্রতি অনুরাগ জন্মিল। চিত্তের া এই যে, যে মানসিক কর্ম্ম যত অধিক বার করা যায়, সে কর্ম্মে তত অধিক ্বৃত্তি হয়; সে কর্ম্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়। লুৎফ-উন্নিসা সেই মূর্ত্তি অহরহঃ মনে বিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজস্পৃহাপ্রবাহও াবার্য্য হইয়া উঠিল। দিল্লীর সিংহাসনলালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন

যেন মন্মথশরসম্ভূত অগ্নিরাশিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন, সকল বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়জন-সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন, সে প্রিয়জন নবকুমার।

এই জন্যই লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসার আশানাশিনী কথা শুনিয়াও অসুখী হয়েন নাই; এই জন্যই আগ্রায় আসিয়া সম্পদ্‌রক্ষায় কোন যত্ন পাইলেন না; এই জন্যই জন্মের মত বাদশাহের নিকট বিদায় লইলেন।

লুৎফ-উন্নিসা সপ্তগ্রামে আসিলেন। রাজপথের অনতিদূরে নগরীর মধ্যে এক অট্টালিকায় আপন বাসস্থান করিলেন। রাজপথের পথিকেরা দেখিলেন, অকস্মাৎ এই অট্টালিকা সুবর্ণখচিতবসনভূষিত দাসদাসীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে হর্ম্ম্যসজ্জা অতি মনোহর। গন্ধদ্রব্য, গন্ধবারি, কুসুমদাম সর্ব্বত্র আমোদ করিতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্তাদিখচিত গৃহশোভার্থ নানা দ্রব্য সকল স্থানেই আলো করিতেছে। এইরূপ সজ্জীভূত এক কক্ষে লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে বসিয়া আছেন; পৃথগাসনে নবকুমার বসিয়া আছেন। সপ্তগ্রামে নবকুমারের সহিত লুৎফ-উন্নিসার আর দুই একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাতে লুৎফ-উন্নিসার মনোরথ কত দূর সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অদ্যকার কথায় প্রকাশ হইবে।

নবকুমার কিছু ক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তবে আমি এক্ষণে চলিলাম। তুমি আর আমাকে ডাকিও না।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "যাইও না। আর একটু থাক। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা সমাপ্ত করি নাই।"

নবকুমার আরও ক্ষণেক প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা কিছু বলিলেন না। ক্ষণেক পরে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি বলিবে?" লুৎফ-উন্নিসা কোন উত্তর করিলেন না—তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন।

নবকুমার ইহা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধৃত করিলেন। নবকুমার ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি, বল না?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ্‌, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব; কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসী!"

নবকুমার কহিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধনসম্পদ্‌ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।"

যবনীজার। নবকুমার এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে, এই রমণী তাঁহার পত্নী।
ফ-উন্নিসা অধোবদনে রহিলেন। নবকুমার তাঁহার হস্ত হইতে বস্ত্রাগ্রভাগ মুক্ত
রিলেন। লুৎফ-উন্নিসা আবার তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন,

"ভাল, সে যাউক। বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তিসকল অতল জলে
াইব। আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক
বার দেখা দিও, কেবল চক্ষুঃপরিতৃপ্তি করিব।"

নব। তুমি যবনী—পরস্ত্রী—তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ। তোমার
তে আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।

ক্ষণেক নীরব। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল। প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ
স্পন্দ রহিলেন। নবকুমারের বস্ত্রাগ্রভাগ ত্যাগ করিলেন। কহিলেন, "যাও।"

নবকুমার চলিলেন। দুই চারি পদ চলিয়াছেন মাত্র, সহসা লুৎফ-উন্নিসা
তান্মুলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাহুলতায় চরণযুগল বদ্ধ করিয়া
তরস্বরে কহিলেন,

"নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি
মায় ত্যাগ করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।"

"এ জন্মে নহে।" লুৎফ-উন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন, "এ জন্মে
মার আশা ছাড়িব না।" মস্তক উন্নত করিয়া, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া,
কুমারের মুখপ্রতি অনিমিষ আয়ত চক্ষু স্থাপিত করিয়া, রাজরাজমোহিনী দাঁড়াইলেন।
অনবনমনীয় গর্ব্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল; যে
জয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্য-শাসনকল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার
য়তুর্ব্বল দেহে সঞ্চারিত হইল। ললাটদেশে ধমনী সকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা
া দিল; জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুঃ রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল; নাসারন্ধ্র
পিতে লাগিল। স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি
য়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক
দয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।"

সেই কুপিতফণিনীমূর্ত্তি প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে নবকুমার ভীত হইলেন।
ফ-উন্নিসার অনির্ব্বচনীয় দেহমহিমা এখন যেরূপ দেখিতে পাইলেন, সেরূপ আর

কখনও দেখেন নাই। কিন্তু সে শ্রী বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী; দেখিয়া ভয় হইল। নবকুমার চলিয়া যান, তখন সহসা তাঁহার আর এক তেজোময়ী মূর্ত্তি মনে পড়িল। এক দিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; এমনই তাহার চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল; এমনই ললাটে রেখাবিকাশ হইয়াছিল; এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল; এমনই মস্তক হেলিয়াছিল। বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই, এখন মনে পড়িল। অমনই সাদৃশ্য অনুভূত হইল। সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সঙ্কুচিত স্বরে, ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি কে?"

যবনীর নয়নতারা আরও বিস্ফারিত হইল। কহিলেন, "আমি পদ্মাবতী।"

উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া লুৎফ-উন্নিসা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। নবকুমারও অন্যমনে কিছু শঙ্কান্বিত হইয়া, আপন আলয়ে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—•—

উপনগরপ্রান্তে

"—————I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat."

Macbeth.

কক্ষান্তরে গিয়া লুৎফ-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত সেই কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন না। এই দুই দিনে তিনি নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিলেন। স্থির করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সূর্য্য অস্তাচলগামী। তখন লুৎফ-উন্নিসা পেষমনের সাহায্যে বেশভূষা করিতেছিলেন। আশ্চর্য্য বেশভূষা! রমণীবেশের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। যে বেশভূষা করিলেন, তাহা মুকুরে দেখিয়া পেষমন্‌কে কহিলেন, "কেমন, পেষমন্, আর আমাকে চেনা যায়?"

পেষমন্ কহিল, "কার সাধ্য?"

লু। তবে আমি চলিলাম। আমার সঙ্গে যেন কোন দাস দাসী না যায়।

পেষমন্ কিছু সঙ্কুচিতচিত্তে কহিল, "যদি দাসীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে একটী। জিজ্ঞাসা করি।" লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "কি?" পেষমন্ কহিল, "আপনার দশ্য কি?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ। য তিনি আমার হইবেন।"

পে। বিবি! ভাল করিয়া বিবেচনা করুন; সে নিবিড় বন, রাত্রি আগত; পনি একাকিনী।

লুৎফ-উন্নিসা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। গ্রামের যে জনহীন বনময় উপনগরপ্রান্তে নবকুমারের বসতি, সেই দিকে চলিলেন। প্রদেশে উপনীত হইতে রাত্রি হইয়া আসিল। নবকুমারের বাটীর অনতিদূরে এক বড় বন আছে, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারে। তাহারই প্রান্তভাগে উপনীত য়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিছু কাল বসিয়া যে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত য়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার অননুভূতপূর্ব্ব সহায় স্থিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসা যথায় বসিয়াছিলেন, তথা হইতে এক অনবরত সমানোচ্চারিত ষ্যকণ্ঠনির্গত শব্দ শুনিতে পাইলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারি দিক্ চাহিয়া দেখিলেন যে, মধ্যে একটী আলো দেখা যাইতেছে। লুৎফ-উন্নিসা সাহসে পুরুষের অধিক; যথায় লো জ্বলিতেছে, সেই স্থানে গেলেন। প্রথমে বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিলেন, ব্যাপার ? দেখিলেন যে, যে আলো জ্বলিতেছিল, সে হোমের আলো; যে শব্দ শুনিতে ইয়াছিলেন, সে মন্ত্রপাঠের শব্দ। মন্ত্রমধ্যে একটী শব্দ বুঝিতে পারিলেন, সে একটী ম। নাম শুনিবামাত্র লুৎফ-উন্নিসা হোমকারীর নিকট গিয়া বসিলেন।

এক্ষণে তিনি তথায় বসিয়া থাকুন; পাঠক মহাশয় বহু কাল কপালকুণ্ডলার কোন বাদ পান নাই, সুতরাং কপালকুণ্ডলার সংবাদ আবশ্যক হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

—•—

শয়নাগারে

"রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।"

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিক কাল নবকুমারের গৃহিণী। যে দিন প্রদোষকালে লুৎফ-উন্নিসা কাননে, সে দিন কপালকুণ্ডলা অন্যমনে শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন। পাঠক মহাশয় সমুদ্রতীরে আলুলায়িতকুন্তলা ভূষণহীনা যে কপালকুণ্ডলা দেখিয়াছেন, এ সে কপালকুণ্ডলা নহে। শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে; স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে, এই ক্ষণে সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল ভুজঙ্গের ব্যূহতুল্য, আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ হইয়াছে। বেণীরচনায়ও শিল্পপারিপাট্য লক্ষিত হইতেছে, কেশবিন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শ্যামাসুন্দরীর বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। কুসুমদামও পরিত্যক্ত হয় নাই, চতুষ্পার্শে কিরীটমণ্ডলস্বরূপ বেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেশের যে ভাগ বেণীমধ্যে ন্যস্ত হয় নাই, তাহা যে মাথার উপরে সর্ব্বত্র সমানোচ্চ হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে। আকুঞ্চন প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণ-তরঙ্গরেখায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্দ্ধলুক্কায়িত নহে; জ্যোতির্ম্ময় হইয়া শোভা পাইতেছে, কেবলমাত্র স্থানে স্থানে বন্ধনবিস্রংসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকাগুচ্ছ তদুপরি স্বেদবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বর্ণ সেই অর্দ্ধপূর্ণশশাঙ্করশ্মিরুচির। এখন দুই কর্ণে হেমকর্ণভূষা দুলিতেছে; কণ্ঠে হিরণ্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে। বর্ণের নিকট

সকল ম্লান হয় নাই, অৰ্দ্ধচন্দ্ৰকৌমুদীবসনা ধরণীর অঙ্কে নৈশ কুসুমবৎ শোভা পাইতেছে। ার পরিধানে শুক্লাম্বর; সে শুক্লাম্বর অৰ্দ্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশমণ্ডলে অনিবিড় শুক্ল মেঘের া শোভা পাইতেছে।

বর্ণ সেইরূপ চন্দ্রার্দ্ধকৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন কাশপ্রান্তে কোথা কাল মেঘ দেখা দিয়াছে। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বসিয়া ছিলেন সখী শ্যামাসুন্দরী নিকটে বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পরস্পরের কথোপকথন তেছিল। তাহার কিয়দংশ পাঠক মহাশয়কে শুনিতে হইবে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "ঠাকুরজামাই আর কত দিন এখানে থাকিবেন?"

শ্যামা কহিলেন, "কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজি রাত্রে যদি ঔষধটী য়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে হর হইয়াছিলাম বলিয়া নাথি ঝাঁটা খাইলাম, আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে?"

ক। দিনে তুলিলে কেন হয় না?

শ্যা। দিনে তুলিলে ফল্‌বে কেন? ঠিক্ দুই প্রহর রাত্রে এলো চুলে তুলিতে হয়। ভাই, মনের সাধ মনেই রহিল।

ক। আচ্ছা, আমি ত আজ দিনে সে গাছ চিনে এসেছি, আর যে বনে হয়, তাও থ এসেছি। তোমাকে আজি আর যেতে হবে না, আমি একা গিয়া ঔষধ তুলিয়া নেব।

শ্যা। এক দিন যা হইয়াছে তা হইয়াছে। রাত্রে তুমি আর বাহির হইও না।

ক। সে জন্য তুমি কেন চিন্তা কর? শুনেছ ত, রাত্রে বেড়ান আমার ছেলেবেলা ত অভ্যাস। মনে ভেবে দেখ, যদি আমার সে অভ্যাস না থাকিত, তবে তোমার আমার কখনও চাক্ষুষ হইত না।

শ্যা। সে ভয়ে বলি না। কিন্তু একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ-ভাল। দুই জনে গিয়াও এত তিরস্কার খাইলাম, তুমি একাকিনী গেলে কি রক্ষা হবে?

ক। ক্ষতিই কি? তুমিও কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির লই কুচরিত্রা হইব?

শ্যা। আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দলোকে মন্দ বল্‌বে।

ক। বলুক, আমি তাতে মন্দ হব না।

শ্যা। তা ত হবে না—কিন্তু তোমাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।

ক। এমন অন্যায় ক্লেশ হইতে দিও না।

শ্যা। তাও আমি পারিব। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?

কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি নিজ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

ইহার পর আর কথা শ্যামাসুন্দরী ভাল বুঝিলেন না। আত্মকর্ম্মে উঠিয়া গেলেন।

কপালকুণ্ডলা প্রয়োজনীয় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া ওষধির অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছিল। নিশা সজ্যোৎস্না। নবকুমার বহিঃপ্রকোষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, কপালকুণ্ডলা যে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তাহা গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃণ্ময়ীর হাত ধরিলেন। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি?"

নবকুমার কহিলেন, "কোথা যাইতেছ?" নবকুমারের স্বরে তিরস্কারের সূচনামাত্র ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।"

নবকুমার পূর্ব্ববৎ কোমল স্বরে কহিলেন, "ভাল, কালি ত একবার গিয়াছিলে? আজি আবার কেন?"

ক। কালি খুঁজিয়া পাই নাই; আজি আবার খুঁজিব।

নবকুমার অতি মৃদুভাবে কহিলেন, "ভাল, দিনে খুঁজিলেও ত হয়?" নবকুমারের স্বর স্নেহপরিপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দিবসে ও ঔষধ ফলে না।"

নব। কাজই কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও। আমি ওষধি তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকে এলো চুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলা এই কথা অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন। নবকুমার আর আপত্তি
লেন না। বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিতবচনে কহিলেন, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে
য়া যাও।"

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশ্বাসসহকারে কপালকুণ্ডলার
ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বনমধ্যে
শ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

কাননতলে

"—Tender is the night,
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no light."

Keats.

সপ্তগ্রামের এই ভাগ যে বনময়, তাহা পূর্ব্বেই কতক কতক উল্লিখিত হইয়াছে।
র কিছু দূরে নিবিড় বন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী এক সঙ্কীর্ণ বন্য পথে ওষধির
ন চলিলেন। যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে
রশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ড-সকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ,
সকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্র-সকল সে
ণর প্রতিঘাত করিতেছে। নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকশিত হইয়া
াছে। পশু পক্ষী নীরব। কেবল কদাচিৎ মাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দন-
কোথাও ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাতশব্দ; কোথাও তলস্থ শুষ্কপত্রমধ্যে উরগজাতীয় জীবের
গতিজনিত শব্দ; ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুক্কুররব। এমত নহে যে, একেবারে বায়ু

বহিতেছিল না; মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু অতি মন্দ; একান্ত নিঃশব্দ বায়ু মাত্র; তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্ব্বাগ্রভাগারূঢ় পত্রগুলি হেলিতেছিল; কেবলমাত্র আভূমি-প্রণত শ্যামা লতা দুলিতেছিল; কেবলমাত্র নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কেবলমাত্র তদ্রূপ বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত পূর্ব্বসুখের অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।

কপালকুণ্ডলার সেইরূপ পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল; বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগরবারিবিন্দুসংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার লম্বালকমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল; অমল নীলানন্ত গগনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন; সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বস্মৃতি সমালোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিলেন।

অন্যমনে যাইতে যাইতে কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহা ভাবিলেন না। যে পথে যাইতেছিলেন, তাহা ক্রমে অগম্য হইয়া আসিল; বন নিবিড়তর হইল, মাথার উপর বৃক্ষশাখাবিন্যাসে চন্দ্রালোক প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল; ক্রমে আর পথ দেখা যায় না। পথের অলক্ষ্যতায় প্রথমে কপালকুণ্ডলা চিন্তামগ্নতা হইতে উত্থিত হইলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এই নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে। লুৎফ-উন্নিসাও পূর্ব্বে এই আলো দেখিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে ভয়হীনা, অথচ কৌতূহলময়ী। ধীরে ধীরে সেই দীপজ্যোতির অভিমুখে গেলেন। দেখিলেন, যথায় আলো জ্বলিতেছে, তথায় কেহ নাই। কিন্তু তাহার অনতিদূরে বননিবিড়তা হেতু দূর হইতে অদৃশ্য একটী ভগ্ন গৃহ আছে। গৃহটী ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য, তাহাতে একটীমাত্র ঘর। সেই ঘর হইতে মনুষ্যকথোপকথনশব্দ নির্গত হইতেছিল। কপালকুণ্ডলা নিঃশব্দপদক্ষেপে গৃহ-সন্নিধানে গেলেন। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বোধ হইল, দুই জন মনুষ্য সাবধানে কথোপকথন করিতেছে। প্রথমে কথোপকথন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে ক্রমে চেষ্টাজনিত কর্ণের তীক্ষ্ণতা জন্মিলে নিম্নলিখিত মত কথা শুনিতে পাইলেন।

এক জন কহিতেছে, "আমার অভীষ্ট মৃত্যু, ইহাতে তোমার অভিমত না হয়, আমি তোমার সাহায্য করিব না; তুমিও আমার সহায়তা করিও না।"

অপর ব্যক্তি কহিল, "আমিও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি; কিন্তু যাবজ্জীবন জন্য ইহার নির্ব্বাসন হয়, তাহাতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু হত্যার কোন উদ্যোগ আমা হইতে হইবে না; বরং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিব।"

প্রথমালাপকারী কহিল, "তুমি অতি অবোধ, অজ্ঞান। তোমায় কিছু জ্ঞানদান করিতেছি। মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। অতি গূঢ় বৃত্তান্ত বলিব; চতুর্দ্দিক্ একবার দেখিয়া আইস, যেন মনুষ্যশ্বাস শুনিতে পাইতেছি।

বাস্তবিক কপালকুণ্ডলা কথোপকথন উত্তমরূপে শুনিবার জন্য কক্ষপ্রাচীরের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয় ও শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরু শ্বাস বহিতেছিল।

সমভিব্যাহারীর কথায় গৃহমধ্যস্থ এক ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন, এবং আসিয়াই কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইলেন। কপালকুণ্ডলাও পরিষ্কার চন্দ্রালোকে আগন্তুক পুরুষের অবয়ব সুস্পষ্ট দেখিলেন। দেখিয়া ভীতা হইবেন, কি প্রফুল্লিতা হইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, আগন্তুক ব্রাহ্মণবেশী; সামান্য ধুতি পরা; গাত্র উত্তরীয়ে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত। ব্রাহ্মণকুমার অতি কোমলবয়স্ক; মুখমণ্ডলে বয়শ্চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। মুখখানি পরম সুন্দর, সুন্দরী রমণীমুখের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু রমণীদুর্ল্লভ তেজোগর্ব্ববিশিষ্ট। তাঁহার কেশগুলি সচরাচর পুরুষদিগের কেশের ন্যায় ক্ষৌরকার্য্যাবশেষাত্মক মাত্র নহে, স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অচ্ছিন্নাবস্থায় উত্তরীয়-প্রচ্ছন্ন করিয়া পৃষ্ঠদেশে, অংসে, বাহুদেশে, কদাচিৎ বক্ষে সংসর্পিত হইয়া পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, ঈষৎ স্ফীত, মধ্যস্থলে একমাত্র শিরাপ্রকাশশোভিত। চক্ষু দুটী বিদ্যুত্তেজঃপরিপূর্ণ। কোষশূন্য এক দীর্ঘ তরবারি হস্তে ছিল। কিন্তু এ রূপরাশিমধ্যে এক ভীষণ ভাব ব্যক্ত হইতেছিল। হেমকান্ত বর্ণে যেন কোন করাল কামনার ছায়া পড়িয়াছিল। অন্তস্তল পর্য্যন্ত অন্বেষণক্ষম কটাক্ষ দেখিয়া কপালকুণ্ডলার ভীতিসঞ্চার হইল।

উভয়ে উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। প্রথমে কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করিলেন। কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করাতে আগন্তুক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

যদি এক বৎসর পূর্ব্বে হিজলীর কিয়াবনে কপালকুণ্ডলার প্রতি এ প্রশ্ন হইত, তবে তিনি তৎক্ষণেই সঙ্গত উত্তর দিতেন। কিন্তু এখন কপালকুণ্ডলা কতক দূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন, সুতরাং সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে নিরুত্তর দেখিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "কপালকুণ্ডলা! তুমি রাত্রে এ নিবিড় বনমধ্যে কি জন্য আসিয়াছ ?"

অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কপালকুণ্ডলা অবাক্ হইলেন, কিছু ভীতাও হইলেন। সুতরাং সহসা কোন উত্তর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

ব্রাহ্মণবেশী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ?"

সহসা কপালকুণ্ডলা বাক্‌শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ কাননমধ্যে তোমরা দুই জনে এ নিশীথে কি কুপরামর্শ করিতেছিলে?"

ব্রাহ্মণবেশী কিছু কাল নিরুত্তরে চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। যেন কোন নূতন ইষ্টসিদ্ধির উপায় তাঁহার চিত্তমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কপালকুণ্ডলার হস্ত-ধারণ করিলেন এবং হস্ত ধরিয়া ভগ্ন গৃহ হইতে কিছু দূরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা অতি ক্রোধে হস্ত মুক্ত করিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণবেশী অতি মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলার কানের কাছে কহিলেন,

"চিন্তা কি? আমি পুরুষ নহি।"

কপালকুণ্ডলা আরও চমৎকৃতা হইলেন। এ কথায় তাঁহার কতক বিশ্বাস হইল, সম্পূর্ণ বিশ্বাসও হইল না। তিনি ব্রাহ্মণবেশধারিণীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ভগ্ন গৃহ হইতে অদৃশ্য স্থানে গিয়া ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কর্ণে কর্ণে কহিলেন, "আমরা যে কুপরামর্শ করিতেছিলাম, তাহা শুনিবে? সে তোমারই সম্বন্ধে।"

কপালকুণ্ডলার আগ্রহ অতিশয় বাড়িল। কহিলেন, "শুনিব।"

ছদ্মবেশিনী বলিলেন, "তবে যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করি, ততক্ষণ এই স্থানে প্রতীক্ষা কর।"

এই বলিয়া ছদ্মবেশিনী ভগ্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; কপালকুণ্ডলা কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছু ভয় জন্মিয়াছিল। এক্ষণে একাকিনী অন্ধকার বনমধ্যে বসিয়া থাকাতে উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। বিশেষ এই ছদ্মবেশী তাঁহাকে কি অভিপ্রায়ে তথায় বসাইয়া গেল, তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত সুযোগ পাইয়া আপনার মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। এদিকে ব্রাহ্মণবেশীর প্রত্যাগমনে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর বসিতে পারিলেন না। উঠিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল; কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে

রিলেন না। শীঘ্রপদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার য়ে যেন পশ্চাদ্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া দ্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার চাৎ আসিতেছেন। বনত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র বনপথে আসিয়া বাহির হইলেন। ায় তাদৃশ অন্ধকার নহে; দৃষ্টিপথে মনুষ্য থাকিলে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখা ল না। অতএব দ্রুতপদে চলিলেন। কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্যগতিশব্দ শুনিতে ইলেন। আকাশ নীল কাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল। কপালকুণ্ডলা আরও দ্রুত লেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহপ্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি ভীষণরবে ঘোষিত হইল। কপালকুণ্ডলা দৌড়িলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল, সেও যেন ৌড়িল, এমত শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি পালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং শনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি ড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গণ-মি পার হইয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ রিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিলেন। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণভূমিতে এক র্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবার বিদ্যুতেই াহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগরতীরপ্রবাসী সেই কাপালিক। ✓

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

স্বপ্নে

"I had a dream, which was not all a dream."

Byron.

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ধীরে ধীরে শয়নাগারে আসিলেন, ারে ধীরে পালঙ্কে শয়ন করিলেন। মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ

সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে? কপালকুণ্ডলার হৃদয়সমুদ্রে যে তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, কে তাহা গণিবে?

সে রাত্রে নবকুমার হৃদয়বেদনায় অন্তঃপুরে আইসেন নাই। শয়নাগারে একাকিনী কপালকুণ্ডলা শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। প্রবলবায়ুতাড়িত বারিধারাপরিসিঞ্চিত জটাজূটবেষ্টিত সেই মুখমণ্ডল অন্ধকার মধ্যেও চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাপালিকের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; কাপালিক নিবিড় বনমধ্যে যে সকল পৈশাচিক কার্য্য করিতেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; তৎকৃত ভৈরবীপূজা, নবকুমারের বন্ধন, এ সকল মনে পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা শিহরিয়া উঠিলেন। অদ্যকার রাত্রের সকল ঘটনাও মনোমধ্যে আসিতে লাগিল। শ্যামার ওষধিকামনা, নবকুমারের নিষেধ, তাঁহার প্রতি কপালকুণ্ডলার তিরস্কার, তৎপরে অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী শোভা, কাননতলে অন্ধকার, সেই অরণ্যমধ্যে যে সহচর পাইয়াছিলেন, তাহার ভীমকান্তগুণময় রূপ; সকলই মনে পড়িতে লাগিল।

পূর্ব্ব দিকে উষার মুকুটজ্যোতিঃ প্রকটিত হইল; তখন কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগরহৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। *তরণী সুশোভিত; তাহাতে বসন্ত রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে; নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধা শ্যামের অনন্ত প্রণয়গীত করিতেছে। পশ্চিম গগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে; আকাশমণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণবৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণমেঘসকল কোথায় গেল। নিবিড়নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক্ নিরূপণ হয় না। নাবিকেরা তরি ফিরাইল। কোন্ দিকে বাহিবে, স্থিরতা পায় না। তাহারা গীত বন্ধ করিল, গলার মালা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল; বসন্ত রঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল; বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তরঙ্গমধ্য হইতে এক জন জটাজূটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বামহস্তে তুলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে সেই ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরি ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি, কি নিমগ্ন করি?" অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে

হর হইল, "নিমগ্ন কর।" ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী ন, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, "আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি চালে প্রবেশ করি।" ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে বশ করিল।

ঘর্ম্মাক্তকলেবরা হইয়া কপালকুণ্ডলা স্বপ্নোত্থিতা হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; খিলেন, প্রভাত হইয়াছে—গবাক্ষ মুক্ত রহিয়াছে; তন্মধ্য দিয়া বসন্তবায়ুস্রোতঃ প্রবেশ রিতেছে; মন্দান্দোলিত বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণ কূজন করিতেছে। সেই গবাক্ষের উপর চকগুলি মনোহর বন্যলতা সুবাসিত কুসুমসহিত দুলিতেছে। কপালকুণ্ডলা নারীস্বভাব-তঃ লতাগুলি গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। তাহা সুশৃঙ্খল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হার মধ্য হইতে একখানি লিপি বাহির হইল। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর ছাত্র; পড়িতে রিতেন। নিম্নোক্ত মত পাঠ করিলেন।

"অদ্য সন্ধ্যার পর কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবা। তোমার নিজ পর্কীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে, তাহা শুনিবে।

অহং ব্রাহ্মণবেশী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃতসঙ্কেতে

"————————I will have grounds
More relative than this."

Hamlet.

কপালকুণ্ডলা সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনন্যচিন্তা হইয়া কেবল ইহাই বিবেচনা করিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ বিধেয় কি না। পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জ্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা ভাবিয়া তাঁহার

মনে সঙ্কোচ জন্মে নাই ; তদ্বিষয়ে তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দূষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই—পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী পুরুষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল ; বিশেষ ব্রাহ্মণবেশী পুরুষ কি না, তাহাতে সন্দেহ। সুতরাং সে সঙ্কোচ অনাবশ্যক, কিন্তু এ সাক্ষাতে মঙ্গল, কি অমঙ্গল জন্মিবে, তাহাই অনিশ্চিত বলিয়া কপালকুণ্ডলা এত দূর সঙ্কোচ করিতেছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণবেশীর কথোপকথন, পরে কাপালিকের দর্শন, তৎপরে স্বপ্ন, এই সকল হেতুতে কপালকুণ্ডলার নিজ অমঙ্গল যে অদূরবর্ত্তী, এমত সন্দেহ প্রবল হইয়াছিল। সেই অমঙ্গল যে কাপালিকের আগমনসহিত সম্বন্ধমিলিত, এমত সন্দেহও অমূলক বোধ হইল না। এই ব্রাহ্মণবেশীকে তাহারই সহচর বোধ হইতেছে—অতএব তাহার সহিত সাক্ষাতে সেই আশঙ্কার বিষয়ীভূত অমঙ্গলে পতিতও হইতে পারেন। সে ত স্পষ্ট বলিয়াছে যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই পরামর্শ হইতেছিল। কিন্তু এমতও হইতে পারে যে, ইহা হইতে তন্নিরাকরণ-সূচনা হইবে। ব্রাহ্মণকুমার এক ব্যক্তির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিল, সে ব্যক্তিকে এই কাপালিক বলিয়া বোধ হয়। সেই কথোপকথনে কাহারও মৃত্যুর সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছিল ; নিতান্ত পক্ষে চিরনির্ব্বাসন। সে কাহার ? ব্রাহ্মণবেশী ত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই কুপরামর্শ হইতেছিল। তবে তাহারই মৃত্যু বা তাহারই চিরনির্ব্বাসন কল্পনা হইতেছিল। হইলই বা! তার পর স্বপ্ন,—সে স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি ? স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী মহাবিপত্তিকালে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই ফলিতেছে। ব্রাহ্মণবেশী সকল কথা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন, "নিমগ্ন কর।" কার্য্যেও কি সেইরূপ বলিবেন ? না—না—ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্নে তাঁহার রক্ষাহেতু উপদেশ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চাহিতেছেন ; তাহার সাহায্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইবেন। অতএব কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না, তাহাতে সন্দেহ ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংশ্রব নাই। কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্ত-রূপরাশিদর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশবনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসি-পালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানীভক্তিভাববিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে গৃহকর্ম্ম কতক কতক সমাপন করিয়া কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বমত বনাভিমুখে ৷া করিলেন। কপালকুণ্ডলা যাত্রাকালে শয়নাগারে প্রদীপটী উজ্জ্বল করিয়া গেলেন। নি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল। — Omen

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা এক কথা বিস্মৃত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী কোন্ স্থানে ক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলেন? এই জন্য পুনর্ব্বার লিপিপাঠের আবশ্যক হইল। গৃহে ত্যাবর্ত্তন করিয়া যে স্থানে প্রাতে লিপি রাখিয়াছিলেন, সে স্থান অন্বেষণ করিলেন, সে নে লিপি পাইলেন না। স্মরণ হইল যে, কেশবন্ধন সময়ে ঐ লিপি সঙ্গে রাখিবার জন্য রীমধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। অতএব কবরীমধ্যে অঙ্গুলি দিয়া সন্ধান করিলেন। লিতে লিপি স্পর্শ না হওয়াতে কবরী আলুলায়িত করিলেন, তথাপি সে লিপি পাইলেন । তখন গৃহের অন্যান্য স্থানে তত্ত্ব করিলেন। কোথাও না পাইয়া, পরিশেষে পূর্ব্ব-ক্ষাৎস্থানেই সাক্ষাৎ সম্ভব সিদ্ধান্ত করিয়া পুনর্যাত্রা করিলেন। অনবকাশপ্রযুক্ত সে শাল কেশরাশি পুনর্বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই, অতএব আজি কপালকুণ্ডলা অনূঢ়া-লের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

গৃহদ্বারে

> "Stand you awhile apart,
> Confine yourself but in a patient list."
>
> *Othello.*

যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কপালকুণ্ডলা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, তখন লিপি রীবন্ধনচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাহা জানিতে পারেন ই। নবকুমার তাহা দেখিয়াছিলেন। কবরী হইতে পত্র খসিয়া পড়িল দেখিয়া কুমার বিস্মিত হইলেন। কপালকুণ্ডলা কার্য্যান্তরে গেলে লিপি তুলিয়া বাহিরে গিয়া ঠ করিলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া একই সিদ্ধান্ত সম্ভবে। "যে কথা কাল শুনিতে

চাহিয়াছিলে, সে কথা শুনিবে।" সে কি? প্রণয়-কথা? ব্রাহ্মণবেশী মৃণ্ময়ীর উপপতি? যে ব্যক্তি পূর্ব্বরাত্রের বৃত্তান্ত অনবগত, তাহার পক্ষে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্ভবে না।

পতিব্রতা, স্বামীর সহগমনকালে, অথবা অন্য কারণে, যখন কেহ জীবিতে চিতারোহণ করিয়া চিতায় অগ্নি সংলগ্ন করে, তখন প্রথমে ধূমরাশি আসিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করে; দৃষ্টিলোপ করে; অন্ধকার করে; পরে ক্রমে কাষ্ঠরাশি জ্বলিতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে নিম্ন হইতে সর্পজিহ্বার ন্যায় দুই একটী শিখা আসিয়া অঙ্গের স্থানে স্থানে দংশন করে, পরে সশব্দে অগ্নিজ্বালা চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া বেষ্টন করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যাপিতে থাকে; শেষে প্রচণ্ড রবে অগ্নিরাশি গগনমণ্ডল জ্বালাময় করিয়া মস্তক অতিক্রমপূর্ব্বক ভস্মরাশি করিয়া ফেলে।

নবকুমারের লিপি পাঠ করিয়া সেইরূপ হইল। প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা। মনুষ্যহৃদয় ক্লেশাধিক্য বা সুখাধিক্য একেবারে গ্রহণ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে। নবকুমারকে প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল; পরে বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল; শেষে বহ্নিরাশিতে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধসত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন; অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন। আর কেহ ইহাতে সন্দিহান হইত, কিন্তু নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ উত্থাপিত হইলে চিরানিবার্য্য বৃশ্চিকদংশনবৎ হইবে জানিয়া, তিনি এক দিনের তরে সন্দেহকে স্থান দান করেন নাই। অদ্যও সন্দেহকে স্থান দিতেন না, কিন্তু অদ্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যন্ত্রণার প্রথম বেগের শমতা হইলে নবকুমার নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। রোদন করিয়া কিছু সুস্থির হইলেন। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যসম্বন্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। আজি তিনি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না। কপালকুণ্ডলা যখন সন্ধ্যার সময় বনাভিমুখে যাত্রা করিবেন, তখন গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিবেন, কপালকুণ্ডলার মহাপাপ প্রত্যক্ষীভূত করিবেন, তাহার পর এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না; আপনার প্রাণসংহার করিবেন। না করিয়া কি করিবেন?—এ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না।

এই স্থির করিয়া কপালকুণ্ডলার বহির্গমন প্রতীক্ষায় তিনি খড়কীদ্বারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। কপালকুণ্ডলা বহির্গতা হইয়া কিছু দূর গেলে নবকুমারও বহির্গত হইতেছিলেন; এমন সময়ে কপালকুণ্ডলা লিপির জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দেখিয়া নবকুমারও সরিয়া গেলেন। শেষে কপালকুণ্ডলা পুনর্ব্বার বাহির হইয়া কিছু দূর গমন করিলে নবকুমার আবার তদনুগমনে বাহির হইতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, দ্বারদেশ আবৃত করিয়া এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কে সে ব্যক্তি, কেন দাঁড়াইয়া, জানিতে নবকুমারের কিছুমাত্র ইচ্ছা হইল না। তাহার প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। কেবল কপালকুণ্ডলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য ব্যস্ত। অতএব পথমুক্তির জন্য আগন্তুকের বক্ষে হস্ত দিয়া তাড়িত করিলেন; কিন্তু তাহাকে সরাইতে পারিলেন না।

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি? দূর হও—আমার পথ ছাড়।"

আগন্তুক কহিল, "কে আমি, তুমি কি চেন না?"

শব্দ সমুদ্রনাদবৎ কর্ণে লাগিল। নবকুমার চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, সে পূর্ব্বপরিচিত জটাজূটধারী কাপালিক।

নবকুমার চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু ভীত হইলেন না। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল—কহিলেন,

"কপালকুণ্ডলা কি তোমার সহিত সাক্ষাতে যাইতেছে?"

কাপালিক কহিল, "না।"

জ্বালিতমাত্র আশার প্রদীপ তখনই নির্ব্বাণ হওয়াতে নবকুমারের মুখ পূর্ব্ববৎ মেঘময় অন্ধকারাবিষ্ট হইল। কহিলেন, "তবে তুমি পথ মুক্ত কর।"

কাপালিক কহিল, "পথ মুক্ত করিতেছি, কিন্তু তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে—অগ্রে শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "তোমার সহিত আমার কি কথা? তুমি আবার আমার প্রাণনাশের জন্য আসিয়াছ? প্রাণ গ্রহণ কর, আমি এবার কোন ব্যাঘাত করিব না। তুমি এক্ষণে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি। কেন আমি দেবতুষ্টির জন্য শরীর না দিলাম? এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিলাম। যে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই আমাকে নষ্ট করিল। কাপালিক! আমাকে এবার অবিশ্বাস করিও না। আমি এখনই আসিয়া তোমাকে আত্মসমর্পণ করিব।"

কাপালিক কহিল, "আমি তোমার প্রাণবধার্থ আসি নাই। ভবানীর তাহা ইচ্ছা নহে। আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা তোমার অনুমোদিত হইবে। বাটীর ভিতরে চল, আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "এক্ষণে নহে। সময়ান্তরে তাহা শ্রবণ করিব, তুমি এখন অপেক্ষা কর; আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—সাধন করিয়া আসিতেছি।"

কাপালিক কহিল, "বৎস! আমি সকলই অবগত আছি; তুমি সেই পাপিষ্ঠার অনুসরণ করিবে; সে যথায় যাইবে, আমি তাহা অবগত আছি। আমি তোমাকে সে স্থানে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইব। যাহা দেখিতে চাহ, দেখাইব—এক্ষণে আমার কথা শ্রবণ কর। কোন ভয় করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "আর তোমাকে আমার কোন ভয় নাই। আইস।"

এই বলিয়া নবকুমার কাপালিককে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আসন দিলেন এবং স্বয়ংও উপবেশন করিয়া বলিলেন, "বল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুনরালাপে

"তদ্গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্।"

কুমারসম্ভব

কাপালিক আসন গ্রহণ করিয়া দুই বাহু নবকুমারকে দেখাইলেন। নবকুমার দেখিলেন, উভয় বাহু ভগ্ন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে রাত্রে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন, সেই রাত্রে তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতে করিতে কাপালিক বালিয়াড়ির শিখরচ্যুত হইয়া পড়িয়া যান। পতনকালে দুই হস্তে ভূমি ধারণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে শরীর রক্ষা হইল বটে, কিন্তু দুইটী হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। কাপালিক এ সকল বৃত্তান্ত নবকুমারের নিকট বিবরিত করিয়া

কহিলেন, "বাহুদ্বারা নিত্যক্রিয়া সকল নির্ব্বাহের কোন বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ইহাতে আর কিছুমাত্র বল নাই। এমন কি, ইহার দ্বারা কাষ্ঠাহরণে কষ্ট হয়।"

পরে কহিতে লাগিলেন, "ভূপতিত হইয়াই যে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার করদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, আর আর অঙ্গ অভগ্ন আছে, এমত নহে, আমি পতনমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। প্রথমে অবিচ্ছেদে অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম। পরে ক্ষণে সজ্ঞান, ক্ষণে অজ্ঞান রহিলাম। কয় দিন যে আমি এ অবস্থায় রহিলাম, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, দুই রাত্রি এক দিন হইবে। প্রভাতকালে আমার সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পুনরাবির্ভূত হইল। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন ভবানী—" বলিতে বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। "যেন ভবানী আসিয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রূকুটী করিয়া আমায় তাড়না করিতেছেন; কহিতেছেন, 'রে দুরাচার, তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এত দিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্ব্বকৃত্যফল বিনষ্ট হইল। আমি তোর নিকট আর কখনও পূজা গ্রহণ করিব না।' তখন আমি রোদন করিয়া জননীর চরণে অবলুণ্ঠিত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'ভদ্র! ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যত দিন না পার, আমার পূজা করিও না।'

"কত দিনে বা কি প্রকারে আমি আরোগ্য প্রাপ্ত হইলাম, তাহা আমার বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। কালে আরোগ্য পাইয়া দেবীর আজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম যে, এই বাহুদ্বয়ে শিশুর বলও নাই। বাহুবল ব্যতীত যত্ন সফল হইবার নহে। অতএব ইহাতে এক জন সহকারী আবশ্যক হইল। কিন্তু মনুষ্যবর্গ ধর্ম্মে অল্পমতি—বিশেষ কলির প্রাবল্যে যবন রাজা, পাপাত্মক রাজশাসনের ভয়ে কেহই এমত কার্য্যে সহচর হয় না। বহু সন্ধানে আমি পাপীয়সীর আবাসস্থান জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু বাহুবলের অভাব হেতু ভবানীর আজ্ঞা পালন করিতে পারি নাই। কেবল মানসসিদ্ধির জন্য তন্ত্রের বিধানানুসারে ক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকি মাত্র। কল্য রাত্রে নিকটস্থ বনে হোম করিতেছিলাম, স্বচক্ষে দেখিলাম, কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণ-কুমারের মিলন হইল। অদ্যও সে তাহার সাক্ষাতে যাইতেছে। দেখিতে চাও, আমার সহিত আইস, দেখাইব।

"বৎস! কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা—আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাহাকে বধ করিব। সেও তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী—তোমারও বধযোগ্যা; অতএব তুমি আমাকে সে সাহায্য প্রদান কর। এই অবিশ্বাসিনীকে ধৃত করিয়া আমার সহিত যজ্ঞস্থানে লইয়া চল। তথায় স্বহস্তে ইহাকে বলিদান কর। ইহাতে ঈশ্বরীর সমীপে যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার মার্জ্জনা হইবে; পবিত্র কর্ম্মে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হইবে, বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড হইবে; প্রতিশোধের চরম হইবে।"

কাপালিক বাক্য সমাপ্ত করিলেন। নবকুমার কিছুই উত্তর করিলেন না। কাপালিক তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা দেখিবে চল।"

নবকুমার ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—*—

সপত্নীসম্ভাষে

"Be at peace; it is your sister that addresses you. Requite Lucretia's love."

Lucretia.

কপালকুণ্ডলা গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে ভগ্নগৃহমধ্যে গেলেন। তথায় ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। যদি দিনমান হইত, তবে দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহার মুখকান্তি অত্যন্ত মলিন হইয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন যে, "এখানে কাপালিক আসিতে পারে, এখানে কোন কথা অবিধি। স্থানান্তরে আইস।" বনমধ্যে একটী অল্পায়ত স্থান ছিল, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষরাজি; মধ্যে পরিষ্কার; তথা হইতে একটী পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে তথায় লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে ব্রাহ্মণবেশী কহিলেন,

"প্রথমতঃ আত্মপরিচয় দিই। কত দূর আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবে। যখন তুমি স্বামীর সঙ্গে হিজলী প্রদেশ হইতে

আসিতেছিলে, তখন পথিমধ্যে রজনীযোগে এক যবনকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তোমার কি তাহা মনে পড়ে?"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যিনি আমাকে অলঙ্কার দিয়াছিলেন?"

ব্রাহ্মণবেশধারিণী কহিলেন, "আমিই সেই।"

কপালকুণ্ডলা অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া কহিলেন, "আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে—আমি তোমার সপত্নী।"

কপালকুণ্ডলা চমৎকৃতা হইয়া কহিলেন, "সে কি?"

লুৎফ-উন্নিসা তখন আনুপূর্ব্বিক আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন। বিবাহ, জাতিভ্রংশ, স্বামী কর্ত্তৃক ত্যাগ, ঢাকা, আগ্রা, জাহাঁগীর, মেহের-উন্নিসা, আগ্রাত্যাগ, সপ্তগ্রামে বাস, নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ, নবকুমারের ব্যবহার, গত দিবস প্রদোষে ছদ্মবেশে কাননে আগমন, হোমকারীর সহিত সাক্ষাৎ, সকলই বলিলেন। এই সময় কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাদিগের বাটীতে ছদ্মবেশে আসিতে বাসনা করিয়াছিলে?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে।"

কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "তাহা কি প্রকারে সিদ্ধ করিতে?"

লুৎফ-উন্নিসা। আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া দিতাম। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি, সে পথ ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যদি আমার পরামর্শমতে কাজ কর, তবে তোমা হইতেই আমার কামনা সিদ্ধ হইবে—অথচ তোমার মঙ্গল সাধন হইবে।

কপা। হোমকারীর মুখে তুমি কাহার নাম শুনিয়াছিলে?

লু। তোমারই নাম। তিনি তোমার মঙ্গল বা অমঙ্গল কামনায় হোম করেন, ইহা জানিবার জন্য প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। যতক্ষণ না তাঁহার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, ততক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলাম। হোমান্তে তোমার নামসংযুক্ত হোমের অভিপ্রায় ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তোমার অমঙ্গলসাধনই হোমের প্রয়োজন। আমারও সেই প্রয়োজন। ইহাও তাঁহাকে জানাইলাম। তৎক্ষণাৎ পরস্পরের সহায়তা করিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষ পরামর্শ জন্য তিনি আমাকে ভগ্ন গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় আপন মনোগত

ব্যক্ত করিলেন। তোমার মৃত্যুই তাঁহার অভীষ্ট। তাহাতে আমার কোন ইষ্ট নাই। আমি ইহজন্মে কেবল পাপই করিয়াছি, কিন্তু পাপের পথে আমার এত দূর অধঃপাত হয় নাই যে, আমি নিরপরাধে বালিকার মৃত্যুসাধন করি। আমি তাহাতে সম্মতি দিলাম না। এই সময়ে তুমি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলে। বোধ করি, কিছু শুনিয়া থাকিবে।

কপা। আমি ঐরূপ বিতর্কই শুনিয়াছিলাম।

লু। সে ব্যক্তি আমাকে অবোধ অজ্ঞান বিবেচনা করিয়া কিছু উপদেশ দিতে চাহিল। শেষটা কি দাঁড়ায়, ইহা জানিয়া তোমায় উচিত সংবাদ দিব বলিয়া তোমাকে বনমধ্যে অন্তরালে রাখিয়া গেলাম।

কপা। তার পর আর ফিরিয়া আসিলে না কেন?

লু। তিনি অনেক কথা বলিলেন, বাহুল্যবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিলম্ব হইল। তুমি সে ব্যক্তিকে বিশেষ জান। কে সে, অনুভব করিতে পারিতেছ?

কপা। আমার পূর্ব্বপালক কাপালিক।

লু। সেই বটে। কাপালিক প্রথমে তোমাকে সমুদ্রতীরে প্রাপ্তি, তথায় প্রতিপালন, নবকুমারের আগমন, তৎসহিত তোমার পলায়ন, এ সমুদয় পরিচয় দিলেন। তোমাদের পলায়নের পর যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহাও বিবৃত করিলেন। সে সকল বৃত্তান্ত তুমি জান না। তাহা তোমার গোচরার্থ বিস্তারিত বলিতেছি।

এই বলিয়া লুৎফ-উন্নিসা কাপালিকের শিখরচ্যুতি, হস্তভঙ্গ, স্বপ্ন, সকল বলিলেন। স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন—চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা বলিতে লাগিলেন,

"কাপালিকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভবানীর আজ্ঞা প্রতিপালন। বাহু বলহীন, এই জন্য পরের সাহায্য তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। আমাকে ব্রাহ্মণতনয় বিবেচনা করিয়া সহায় করিবার প্রত্যাশায় সকল বৃত্তান্ত বলিল। আমি এ পর্য্যন্ত এ দুষ্কর্ম্মে স্বীকৃত হই নাই। এ দুর্ব্বৃত্ত চিত্তের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ভরসা করি যে, কখনই স্বীকৃত হইব না। বরং এ সঙ্কল্পের প্রতিকূলতাচরণ করিব, এই অভিপ্রায়; সেই অভিপ্রায়েই আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু এ কার্য্য নিতান্ত অস্বার্থপর হইয়া করি নাই। তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমি আমার জন্য কিছু কর।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি করিব?"

লু। আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।

কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণের পর কহিলেন, "স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?"

লু। বিদেশে—বহুদূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাস দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন,

"তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাস দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

লুৎফ-উন্নিসা চমৎকৃতা হইলেন, এরূপ আশু স্বীকারের কোন প্রত্যাশা করেন নাই। মোহিত হইয়া কহিলেন, "ভগিনি! তুমি চিরায়ুষ্মতী হও, আমার জীবনদান করিলে। কিন্তু আমি তোমাকে অনাথা হইয়া যাইতে দিব না। কল্য প্রাতে তোমার নিকট আমার এক জন বিশ্বাসযোগ্যা চতুরা দাসী পাঠাইব। তাহার সঙ্গে যাইও। বর্দ্ধমানে কোন অতিপ্রধানা স্ত্রীলোক আমার সুহৃৎ।—তিনি তোমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা এবং কপালকুণ্ডলা এরূপ মনঃসংযোগ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন যে, সম্মুখবিঘ্ন কিছুই দেখিতে পান নাই। যে বন্য পথ তাঁহাদিগের আশ্রয়স্থান হইতে বাহির হইয়াছিল, সে পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কাপালিক ও নবকুমার তাঁহাদিগের প্রতি যে করাল দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহা কিছুই দেখিতে পান নাই।

নবকুমার ও কাপালিক ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তত দূর হইতে তাহাদিগের কথোপকথনের মধ্যে কিছুই তদুভয়ের শ্রুতিগোচর হইল না। মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ যদি সমদূরগামী হইত, তবে মনুষ্যের দুঃখস্রোত শমিত কি বর্দ্ধিত হইত, তাহা কে বলিবে? সংসাররচনা অপূর্ব্ব কৌশলময়।

নবকুমার দেখিলেন, কপালকুণ্ডলা আলুলায়িতকুন্তলা। যখন কপালকুণ্ডলা তাঁহার হয় নাই, তখনই সে কুন্তল বাঁধিত না। আবার দেখিলেন যে, সেই কুন্তলরাশি আসিয়া ব্রাহ্মণকুমারের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া তাঁহার অংসসংবিলম্বী কেশদামের সহিত মিশিয়াছে।

কপালকুণ্ডলার কেশরাশি ঈদৃশ আয়তনশালী, এবং লঘু স্বরে কথোপকথনের প্রয়োজনে উভয়ে এরূপ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বসিয়া ছিলেন যে, লুৎফ-উন্নিসার পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কপালকুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল। তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। দেখিয়া নবকুমার ধীরে ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

কাপালিক ইহা দেখিয়া নিজে কটিবিলম্বী এক নারিকেলপাত্র বিমুক্ত করিয়া কহিল, "বৎস! বল হারাইতেছ, এই মহৌষধ পান কর, ইহা ভবানীর প্রসাদ। পান করিয়া বল পাইবে।"

কাপালিক নবকুমারের মুখের নিকট পাত্র ধরিল। তিনি অন্যমনে পান করিয়া দারুণ তৃষা নিবারণ করিলেন। নবকুমার জানিতেন না যে, এই সুস্বাদু পেয় কাপালিকের স্বহস্তপ্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা। পান করিবামাত্র সবল হইলেন।

এ দিকে লুৎফ-উন্নিসা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলাকে কহিতে লাগিলেন,

"ভগিনি! তুমি যে কার্য্য করিলে, তাহার প্রতিশোধ করিবার আমার ক্ষমতা নাই; তবু যদি আমি চিরদিন তোমার মনে থাকি, সেও আমার সুখ। যে অলঙ্কারগুলি দিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াছি, তুমি দরিদ্রকে বিতরণ করিয়াছ। এক্ষণে নিকটে কিছুই নাই। কল্যকার অন্য প্রয়োজন ভাবিয়া কেশমধ্যে একটী অঙ্গুরীয় আনিয়াছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় সে পাপ প্রয়োজনসিদ্ধির আবশ্যক হইল না। এই অঙ্গুরীয়টী তুমি রাখ। ইহার পরে অঙ্গুরীয় দেখিয়া যুবনী ভগিনীকে মনে করিও। আজি যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করেন, অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে, কহিও, লুৎফ-উন্নিসা দিয়াছে। ইহা কহিয়া লুৎফ-উন্নিসা আপন অঙ্গুলি হইতে বহুধনে ক্রীত এক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলার হস্তে দিলেন। নবকুমার তাহাও দেখিতে পাইলেন; কাপালিক তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে কম্পমান দেখিয়া পুনরপি মদিরা সেবন করাইলেন। মদিরা নবকুমারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকৃতি সংহার করিতে লাগিল, স্নেহের অঙ্কুর পর্য্যন্ত উন্মূলিত করিতে লাগিল।

কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার নিকট বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন নবকুমার ও কাপালিক লুৎফ-উন্নিসার অদৃশ্য পথে কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহাভিমুখে

"No spectre greets me—no vain shadow this."

Wordsworth.

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। অতি ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু চলিলেন। তাহার কারণ, তিনি অতি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন। লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জ্জন কি জন্য? লুৎফ-উন্নিসার জন্য? তাহা নহে।

কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা-প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলা সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জ্জনে তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখদুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোন কার্য্যে ভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না। এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন?

তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া যাহা বলি, এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসারমধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকর্ম্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তবেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসারমধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?

যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার গতি রোধ করে? একবার বায়ু তাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চার নিবারণ করে? কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতিস্থাপন করিবে? নবীন করিকরভ মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে?

কপালকুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব? পঞ্চভূত লইয়া কি হইবে?" প্রশ্ন করিতেছিলেন, অথচ কোন নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। সংসারের অন্য কোন বন্ধন না থাকিলেও পঞ্চভূতের এক বন্ধন আছে।

কপালকুণ্ডলা অধোবদনে চলিতে লাগিলেন। যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকটভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।

যেন ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল, "বৎসে! আমি পথ দেখাইতেছি।" কপালকুণ্ডলা চকিতের ন্যায় ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, যেন আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্ত্তি! গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতস্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে— বাম করে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বলজ্বালাবিভাসিতলোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত! যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।

কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চলিলেন। সেই নবকাদম্বিনীসন্নিভ রূপ আকাশমার্গে তাঁহার আগে আগে চলিল। কখনও কপালমালিনীর অবয়ব মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখনও নয়নপথে স্পষ্ট বিকশিত হয়। কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন।

নবকুমার বা কাপালিক এ সব কিছুই দেখেন নাই। নবকুমার সুরাগরলপ্রজ্বলিত হৃদয়—কপালকুণ্ডলার ধীর পদক্ষেপ অসহিষ্ণু হইয়া সঙ্গীকে কহিলেন, "কাপালিক!"

কাপালিক কহিল, "কি?"

"পানীয়ং দেহি মে।"

কাপালিক পুনরপি তাঁহাকে সুরা পান করাইল।

নবকুমার কহিলেন, "আর বিলম্ব কি?"

কাপালিক উত্তর করিল, "আর বিলম্ব কি?"

নবকুমার ভীম নাদে ডাকিলেন, "কপালকুণ্ডলে!"

কপালকুণ্ডলা শুনিয়া চমকিতা হইলেন। ইদানীন্তন কেহ তাঁহাকে কপালকুণ্ডলা বলিয়া ডাকিত না। তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। নবকুমার ও কাপালিক তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। কপালকুণ্ডলা প্রথমে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না—কহিলেন,

"তোমরা কে? যমদূত?"

পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া কহিলেন, "না না পিতা, তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ?"

নবকুমার দৃঢ় মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিলেন। কাপালিক করুণার্দ্র, মধুময় স্বরে কহিলেন,

"বৎসে! আমাদিগের সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া কাপালিক শ্মশানাভিমুখে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ব্ববৎ দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

—:*:—

প্রেতভূমে

"বপুষা করণোজ্‌ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্‌॥"

রঘুবংশ

চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। কাপালিক যথায় আপন পূজাস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গেলেন। সে

গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ সৈকতভূমি। তাহারই সম্মুখে আরও বৃহত্তর দ্বিতীয় এক খণ্ড সিকতাময় স্থান। সেই সৈকতে শ্মশানভূমি। উভয় সৈকতমধ্যে জলোচ্ছ্বাসকালে অল্প জল থাকে, ভাঁটার সময়ে জল থাকে না। এক্ষণে জল ছিল না। শ্মশানভূমির যে মুখ গঙ্গাসম্মুখীন, সেই মুখ অত্যুচ্চ; জলে অবতরণ করিতে গেলে একেবারে উচ্চ হইতে অগাধ জলে পড়িতে হয়। তাহাতে আবার অবিরতবায়ুতাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকূলতল ক্ষয়িত হইয়াছিল; কখনও কখনও মৃত্তিকাখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া যাইত। পূজাস্থানে দীপ নাই—কাষ্ঠখণ্ড মাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল। বিশাল তরঙ্গিণীহৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্র মাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল; তাহার কারণে তরঙ্গাভিঘাত-জনিত কলকল রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল। শ্মশানভূমিতে শবভুক্ পশুগণ কর্কশকণ্ঠে কচিৎ ধ্বনি করিতেছিল।

কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে উপযুক্ত স্থানে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তন্ত্রাদির বিধানানুসারে পূজারম্ভ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে নবকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন যে, কপালকুণ্ডলাকে স্নাত করাইয়া আন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের আঘাতে একটা জলপূর্ণ শ্মশান-কলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শব পড়িয়া ছিল—হতভাগার কেহ সৎকারও করে নাই। দুই জনেরই তাহাতে পদস্পর্শ হইল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন, নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিক্ বেড়িয়া শবমাংসভুক্ পশুসকল ফিরিতেছিল; মনুষ্য দুই জনের আগমনে উচ্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল, কেহ আক্রমণ করিতে আসিল, কেহ বা পদশব্দ করিয়া চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে; কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিষ্কম্প।

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় পাইতেছ?"

নবকুমারের মদিরার মোহ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। অতি গম্ভীর স্বরে নবকুমার উত্তর করিলেন,

"ভয়ে, মৃণ্ময়ি? তাহা নহে।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কাঁপিতেছ কেন?"

এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে করিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে। কে জানিত যে, আসন্ন কালে শ্মশানে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এ স্বর নির্গত হইবে?

নবকুমার কহিলেন, "ভয় নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, "কাঁদিবে কেন?"

আবার সেই কণ্ঠ!

নবকুমার কহিলেন, "কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃণ্ময়ি! তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই—" বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। "তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

"মৃণ্ময়ি!—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদু স্বরে কহিলেন, "তুমি ত. জিজ্ঞাসা কর নাই!"

যখন এই কথা হইল, তখন উভয়ে একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; কপালকুণ্ডলা অগ্রে, নদীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া ছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে এক পদ পরেই জল। এখন জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল, কপালকুণ্ডলা একটা আড়রির উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই!"

নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, "চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃণ্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রাখ।—গৃহে চল।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজি যাহাকে দেখিয়াছ,—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

"না—মৃণ্ময়ি!—না!—" এইরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না।

চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল ; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদী-প্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।

সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল ?

সম্পূর্ণ

বিভিন্ন সংস্করণে 'কপালকুণ্ডলা'র পাঠভেদ

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণ মিলাইয়া দেখিতে গিয়া পরিবর্ত্তন-বাহুল্য বিশেষভাবে নজরে পড়ে। এ বিষয়ে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> তাঁহার মতামত চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল ছিল, সেই জন্য তাঁহার গ্রন্থগুলি প্রতি সংস্করণে প্রচুরপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইত। এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে 'ইন্দিরা' উপন্যাসটি আবার rewrite করিবেন, এমন ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৩৯।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থগুলির ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ মিলাইয়া দেখিলে উপরোক্ত উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডুলিপিতেও আমরা অনেক কাটাকুটি লক্ষ্য করিয়াছি। 'কপালকুণ্ডলা' তাঁহার দ্বিতীয় মুদ্রিত উপন্যাস; ইহাতেও প্রথম ও পরবর্ত্তী সংস্করণে পার্থক্য আছে। তবে 'কপালকুণ্ডলা'র পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বঙ্কিমের সমসাময়িক সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন—

> অদ্যাবধি ইহার সাতটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই গ্রন্থকার গ্রন্থখানি ভাল করিয়া দেখিয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। সম্প্রতি যে সংস্করণ প্রকাশিত হইল, তাহাতে কিছু পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। পরিবর্ত্তন অতি সামান্য এবং সেই সামান্য পরিবর্ত্তনও গ্রন্থের একটি মাত্র চরিত্র—নবকুমারকে লইয়া।—'বঙ্কিমচন্দ্র'। কপালকুণ্ডলা (১৮৮৮), পৃ. ৩।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে কপালকুণ্ডলার আটটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল; ১ম—সংবৎ ১৯২৩ (১৮৬৬), ২য়—সংবৎ ১৯২৬ (১৮৬৯), ৩য়—১৮৭৪, ৪র্থ—১৮৭৮, ৫ম—১৮৮১, ৬ষ্ঠ—১২৯১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৪), ৭ম—১৮৮৮, ও ৮ম—১৮৯২। তন্মধ্যে আমরা ১ম, ৩য়, ৭ম ও ৮ম সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছি। শব্দ ও বিরামচিহ্নের পরিবর্ত্তন, স্থলে স্থলে বাক্য বা বাক্যাংশ যোগ বা বাক্যের আংশিক পরিবর্ত্তন, শব্দ বাক্য বা বাক্যাংশ পরিত্যাগ—অল্পবিস্তর পরবর্ত্তী প্রত্যেক সংস্করণেই আছে; শেষের দুই সংস্করণে পার্থক্য যৎসামান্য এবং ১ম ও ৩য় সংস্করণও প্রায় অভিন্ন। যাহাতে গল্পের ধারার, কোনও বিশেষ চরিত্রের অথবা ঘটনা-সংস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই এমন খুঁটিনাটি সামান্য পরিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণের শব্দ ও ভাষাগত অশুদ্ধিও পরবর্ত্তী সংস্করণে যে ভাবে শুদ্ধীকৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন।

'কপালকুণ্ডলা' প্রথম সংস্করণ যেরূপ ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহার স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু নূতন অংশ সামান্যই যোজিত হইয়াছে। একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ (চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ) সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কয়েকটি পরিচ্ছেদ অংশত বাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ও অষ্টম সংস্করণের পার্থক্যই নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল।

প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিজনে। পৃ. ১০, ১২ পংক্তির পর বাদ পড়িয়াছে—

পর্ব্বততলচারী ব্যক্তির উপরে শিখরখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহাকে যেমন একেবারে নিষ্পেষিত করে, এ সিদ্ধান্ত জন্মমাত্র নবকুমারের হৃদয়, সেইরূপ একেবারে নিষ্পেষিত হইল।

এ সময়ে, নবকুমারের মনের অবস্থা যেরূপ হইল, তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সঙ্গিগণ প্রাণে নষ্ট হইয়া থাকিবেক, এরূপ সন্দেহে পরিতাপযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু আপনার বিপন্ন অবস্থার সমালোচনায় সে শোক শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন। বিশেষ যখন মনে হইতে লাগিল যে, হয়ত সঙ্গীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন ক্রোধের বেগে শোক দূর হইতে লাগিল।

প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কাপালিকসঙ্গে। পৃ. ১৭, ২ পংক্তির পর বাদ গিয়াছে—

জগতীয় পদার্থ বা ঘটনা সকলের সম্বন্ধ বিচারাকাঙ্ক্ষী চিত্তমাত্রেরই এক এক দিন কোন বিচিত্র ঘটনায় চমৎকার হেতুক মনোবৃত্তি সকল নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে; পূর্ব্বের যাবতীয় স্থির-সিদ্ধান্ত সকল উন্মূলিত হয়। নবকুমারের তাহাই হইল। সুতরাং তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে নিশ্চেষ্ট হইবেন, তাহার বিচিত্র কি!

প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কাপালিকসঙ্গে। পৃ. ১৮, ২৩ পংক্তির পর—

যখন লোকে ইতিকর্ত্তব্য স্থির না করিতে পারে, তখন তাহাদিগকে যে দিকে প্রথম আহূত করা যায়, সেই দিকেই প্রবৃত্ত হয়।

প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ—আশ্রয়ে। পৃ. ২২, ৬ পংক্তি 'উপায় নাই।' ইহার পর ৮ পংক্তি 'দুঃখ করিতেন না।' পর্য্যন্ত অংশ নূতন সংযোজিত। প্রথম সংস্করণে ছিল—

কিন্তু অন্ধকারে বনমধ্যে রমণীকে সকল সময় দেখা যায় না; যুবতী এক দিকে ধাবমানা হইলে, নবকুমার অন্য দিকে যান; রমণী কহিলেন, "আমার অঞ্চল ধর।" নবকুমার তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া চলিলেন।

প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ—আশ্রমে। পৃ. ২৪, ২৫ পংক্তি 'তাহা জান না।'র পর—

স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ না করিলে যে তান্ত্রিক সিদ্ধ হয় না, তাহা তুমি জান না। আমিও তন্ত্রাদি পাঠ করিয়াছি। মা জগদম্বা জগতের মাতা। ইনি সতীর সতীত্ব—সতীপ্রধানা। ইনি সতীত্বনাশসংযুক্ত পূজা কখন গ্রহণ করেন না। এই জন্যই আমি মহাপুরুষের অনভিমত সাধিতেছি। তুমি পলায়ন করিলে কদাপি কৃতঘ্ন হইবে না। কেবল এ পর্য্যন্ত সিদ্ধির সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়া তুমি রক্ষা পাইয়াছ। আজি তুমি যে কার্য্য করিয়াছ—তাহাতে প্রাণেরও আশঙ্কা। এই জন্য বলিতেছি পলায়ন কর। ভবানীরও এই আজ্ঞা। অতএব যাও। আমার এখানে রাখিবার উপায় থাকিলে রাখিতাম; কিন্তু সে ভরসা যে নাই, তাহা ত জান।

উপরি-উক্ত পংক্তিগুলির পরিবর্ত্তে ২৬ পংক্তি হইতে ২৮ পংক্তি (এই বলিয়া…… ভয় হইল।) দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ—দেবনিকেতনে। প্রথমেই একটি অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হইয়াছে; পৃ. ২৮, ১৪ পংক্তির পর এইরূপ ছিল—

পুরুষ পাঠক, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনি যদি কপালকুণ্ডলাকে সমুদ্রতীরে দেখিতেন, তবে এক দিনে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত হইতেন কি না, বলিতে পারি না। প্রাণরক্ষা মাত্র উপকারের অনুরোধে তাহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতেন কি না বলিতে পারি না। বোধ করি নহে, কেন না কপালকুণ্ডলা রুক্ষকেশী সন্ন্যাসিনী মাত্র। কিন্তু নবকুমার পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ করেন;—এ পৃথিবীর কাঠুরিয়ারা সন্ন্যাসিনীদিগের মর্ম্ম বুঝে। কৃতঘ্ন সহযাত্রী-দিগের জন্য নবকুমার মাথায় কাষ্ঠভার বহিয়াছিলেন,—কৃতোপকারিণী সন্ন্যাসিনীর জন্য যে অতুল রূপরাশি হৃদয়ে বহিতে চাহিবেন, তাহার বিচিত্র কি?

দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ—রাজপথে। পৃ. ৩০, প্রথম অনুচ্ছেদের পূর্ব্বে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে—

কোন জার্ম্মান লেখক বলিয়াছেন, "মনুষ্যের জীবন কাব্যবিশেষ।" কপালকুণ্ডলার জীবনকাব্যের এক সর্গ সমাপ্ত হইল। পরে কি হইবে?

যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনুষ্য অন্ধ না হইত, তবে সংসারযাত্রা একেবারে সুখহীন হইত। ভাবী বিপদের সম্ভাবনা নিশ্চিত দেখিতে পাইয়া, কোন সুখেই কেহ প্রবৃত্ত হইত না। মিল্টন যদি জানিতেন তিনি অন্ধ হইবেন, তবে কখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন না; শাহাজাহান যদি

জানিতেন, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে প্রাচীন বয়সে কারাবদ্ধ রাখিবেন, তবে তিনি কখন দিল্লীর সিংহাসন স্পর্শ করিতেন না। ভাস্করাচার্য্য যদি জানিতেন যে, তাঁহার একমাত্র কন্যা চিরবিধবা হইবে, তবে তিনি কখন দারপরিগ্রহ করিতেন না। নবকুমার বা তাঁহার নূতন পত্নী যদি জানিতেন যে, তাঁহাদিগের বিবাহে কি ফলোৎপত্তি হইবে, তবে কখন তাঁহাদিগের বিবাহ হইত না।

দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পান্থনিবাসে। পৃ. ৩২, প্রথম অনুচ্ছেদের পূর্ব্বে ছিল—

আমি বলিয়াছি, নবকুমারের সঙ্গিনী অসামান্য রূপসী। এ স্থলে, যদি প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার রূপবর্ণনে প্রবৃত্ত না হই, তবে পুরুষ পাঠকেরা বড়ই ক্ষুণ্ণ হইবেন। আর যাঁহারা স্বয়ং সুন্দরী, তাঁহারা পড়িয়া বলিবেন, "তবে বুঝি মাগী পাঁচপাচি!" সুতরাং এই কামিনীর রূপ বর্ণনে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু কি লইয়াই বা তাঁহার বর্ণনা করি? কখন কখন বটতলার মা সরস্বতী আমার স্কন্ধে চাপিয়া থাকেন। তাঁহার অনুগ্রহে কতকগুলিন ফলমূলের ডালি সাজাইয়া রূপ বর্ণনার কার্য্য এক প্রকার সাধন করিতে পারি, কিন্তু পাছে দাড়িম্ব রম্ভা ইত্যাদি নাম শুনিয়া পাঠক মহাশয়ের জঠরানল জ্বলিয়া উঠে, এই আশঙ্কায় সে চেষ্টায় বিরত রহিলাম।

দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সুন্দরীসন্দর্শনে। পৃ. ৩৭, প্রথম পংক্তির 'নবকুমারের চক্ষু অস্থির হইল।' ইহার পর বাদ গিয়াছে—

অধিকাংশ স্ত্রীলোক বহুস্বর্ণখচিত হইলে প্রায় কিছু শ্রীহীনা হয়;—অনেকেই সজ্জিতা পুত্তলিকার দশা প্রাপ্ত হয়েন;—কিন্তু মতিবিবিতে সে শ্রীহীনতা বা দশা দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সুন্দরীসন্দর্শনে। পৃ. ৩৭, ১৭ পংক্তির 'মোচন করিতে লাগিলেন।' ইহার পর বাদ গিয়াছে—

নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতেছ?" মতি কহিলেন, "দেখুন না।"

দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—অবরোধে। পৃ. ৪৪, ১৯ পংক্তির পর বাদ গিয়াছে—

শ্যামা কুলীনপত্নী।

আমরাও এই অবকাশে পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখি যে, ফুলের ফুটিয়াই সুখ। পুষ্পরস, পুষ্পগন্ধ, বিতরণই তার সুখ। আদান প্রদানই পৃথিবীর সুখের মূল; তৃতীয় মূল নাই। এ কথা কেবল স্নেহ সম্বন্ধেই যে সত্য, এমত নহে। ধন, মান, সম্পদ্, মহিমা, বিদ্যা, বুদ্ধি, সকলেরই সুখদানশক্তি কেবল মাত্র আদান প্রদান ঘটিত। মৃণ্ময়ী বনমধ্যে থাকিয়া এ কথা কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—অতএব কথার কোন উত্তর দিলেন না।

তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ—রাজনিকেতনে। পৃ. ৫৯, ১৫ পংক্তির পর বাদ গিয়াছে—

সে যাহা হউক, এক্ষণে দাসী বিদায় হয়। পামরীর এমন কোন সাধ নাই যে, জাঁহাগীর শাহের ইচ্ছায় নিবারণ না হয়।

তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ—আত্মমন্দিরে। পৃ. ৬২, ১১ পংক্তির পর বাদ গিয়াছে—

লু। এ হীরার অঙ্গুরী তোমায় কে দিয়াছে?

পে। শাহবাজ খাঁ।

লু। আর সেই পান্নার কণ্ঠী?

পে। আজিম খাঁ।

লু। আর কে কে তোমায় অলঙ্কার দিয়াছে?

পে। (হাসিয়া) করীম খাঁ, কোকলতাষ, রাজা জীবনসিংহ, রাজা প্রতাপাদিত্য, মূসা খাঁ—কত লোক দিয়াছে কাহার নাম করিব। এখন যা পরিয়া আগ্রার পরিচারিকা-মণ্ডলে প্রাধান্য স্বীকার করাই, সে স্বয়ং জাহাঙ্গীরের দান।

লু। ইহার মধ্যে কাহাকে আমি ভাল বাসিতাম?

পে। (হাসিয়া) সকলকেই।

লু। এ ত গেল মুখের কথা। মনের কথা কি?

এই পংক্তিগুলির পরিবর্তে ১২শ পংক্তিটি যোজিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ—শয়নাগারে। পৃ. ৬৮, এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদই বাদ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে তাহা দেওয়া হইল—

গ্রন্থ খণ্ডারম্ভে

"Real Fatalism is of two kinds.* Pure or Asiatic Fatalism, the Fatalism of Œdipus, holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract Destiny, will

overrule them, and compel us to act, not as we desire, but in the manner predestined. The other kind, modified Fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, our will by our desires, and our desires by the joint influence of the motives presented to us and of our individual character."

J. S. Mill.

এত দূরে এ আখ্যায়িকা হৃদয়ঙ্গামিত্ব প্রাপ্ত হইল। চিত্রকর চিত্রপুত্তলী লিখিতে অগ্রে হস্ত পাদাদির রেখানিচয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অঙ্কিত করে, শেষে তৎসমুদয় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া ছায়ালোকভিন্নতা লিখে। আমরা এ পর্য্যন্ত এই মানসচিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ রেখাঙ্কিত করিয়াছি; এক্ষণে তৎসমুদায় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া তাহার ছায়ালোক সন্নিবেশ করিব।

রবিকরাকৃষ্ট বারিবাষ্পে মেঘের জন্ম। দিন দিন, তিল তিল করিয়া, মেঘ সঞ্চারের আয়োজন হইতে থাকে; তখন মেঘ কাহারও লক্ষ্য হয় না; কেহ মেঘ মনে করে না; শেষে অকস্মাৎ একেবারে পৃথিবী ছায়ান্ধকারময়ী করিয়া বজ্রপাত করে। যে মেঘে অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার জীবনযাত্রা গাহমান হইল, আমরা এত দিন তিল তিল করিয়া তাহার বারিবাষ্প সঞ্চয় করিতেছিলাম।

পাঠক মহাশয় "অদৃষ্ট" স্বীকার করেন? ললাট-লিপির কথা বলিতেছি না, সে ত অলস ব্যক্তির আত্মপ্রবোধ জন্য কল্পিত গল্পমাত্র। কিন্তু, কখন কখন যে, কোন ভবিষ্য ঘটনার জন্য পূর্ব্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে, তৎসিদ্ধিসূচক কার্য্য সকল এরূপ দুর্দ্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মানুষিক শক্তি তাহার নিবারণে অসমর্থ হয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন কি না? সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে দূরদর্শিগণ কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদৃষ্ট য়ুনানী নাটকাবলির প্রাণ; সর্ব্বজ্ঞ সেক্‌স্‌পীয়রের মাক্‌বেথের আধার; ওয়ালটর স্কটের "ব্রাইড্ অব লেমার মুরে" ইহার ছায়াপাত হইয়াছে; গেটে প্রভৃতি জর্ম্মান কবিগুরুগণ ইহার স্পষ্টতঃ সমালোচনা করিয়াছেন। রূপান্তরে, "ফেট্" ও "নেসেসিটি" নাম ধারণ করিয়া ইহা ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রধান মতভেদের কারণ হইয়াছে।

অস্মদ্দেশে এই "অদৃষ্ট" জনসমাজে বিলক্ষণ পরিচিত। যে কবিগুরু কুরুকুলসংহার কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি এই মোহমন্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে দীক্ষিত; কৌরবপাণ্ডবের বাল্য-ক্রীড়াবধি এই করালছায়া কুরুশিরে বিদ্যমান; শ্রীকৃষ্ণ ইহার অবতারস্বরূপ। "যদাশ্রৌষং জাতুষাদ্বেশ্মনস্তান্" ইত্যাদি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে কবি স্বয়ং ইহা প্রাঞ্জলীকৃত করিয়াছেন। দার্শনিকদিগের মধ্যে অদৃষ্টবাদীর অভাব নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই অদৃষ্টবাদে পরিপূর্ণ। অধুনা "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" ইতি কবিতার্দ্ধ পাঠ করিয়া অনেকে অদৃষ্টের পূজা করেন। অপর সকলে "কপাল!" বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

অদৃষ্টের তাৎপর্য্য যে কোন দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তিতে অস্মদাদির কার্য্য সকলকে গতিবিশেষ প্রাপ্ত করায়, এমন আমি বলিতেছি না। অনীশ্বরবাদীও অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও মনুষ্যচরিত্রের অনিবার্য্য ফল; মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; সুতরাং অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; কিন্তু সেই সকল নিয়ম মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বলিয়া অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে। *

কোন কোন পাঠক এ গ্রন্থশেষ পাঠ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বলিতে পারেন, "এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল না; গ্রন্থকার অন্যরূপ করিতে পারিতেন।" ইহার উত্তর, "অদৃষ্টের গতি। অদৃষ্ট কে খণ্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে। গ্রন্থারম্ভে যেখানে যে বীজ বপন হইয়াছে, সেইখানে সেই বীজের ফল ফলিবে। তদ্বিপরীতে সত্যের বিঘ্ন ঘটিবে।"

এক্ষণে আমরা অদৃষ্টগতির অনুগামী হই। সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে; গ্রন্থিবন্ধন করি।

চতুর্থ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ—প্রেতভূমে। (১ম সং.—১০ম পরিচ্ছেদ) পৃ. ৯২, ১২ ংক্তির পর বাদ গিয়াছে—

শবভুক্ পক্ষিগণের বৃহৎ পক্ষসঞ্চালনের কচিৎ ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। কপালকুণ্ডলা মানস চক্ষে সেই প্রেতভূমিতে কত প্রেতিনীকে নরদেহ চর্ব্বণ করিতে দেখিতে লাগিলেন; কত পিশাচীকে কর্দ্দমোপরে সশব্দে নাচিয়া বেড়াইতে শুনিতে লাগিলেন।

চতুর্থ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ—প্রেতভূমে। (১ম সং.—১০ম পরিচ্ছেদ) পৃ. ৯৪, শেষ ই পংক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নোক্ত অংশ ছিল—

কাপালিক আসনে বসিয়া দেখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, কি কি, এই আশঙ্কায় কাপালিক আসন ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া কূলে গমন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে কোন পদার্থ ভাসিয়া ডুবিল দেখিলেন—বোধ হইল, যেন মনুষ্যমস্তক মনুষ্যহস্ত। লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন। দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্না আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

---

* কবিদিগের "Destiny" দার্শনিকদিগের "Fate" এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। ভিন্ন ভিন্ন ; ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিতেছি না।

তীরে পুনরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্যবিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্তি হইল। সে বাক্য কেবল "মৃণ্ময়ি! মৃণ্ময়ি!"

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণ্ময়ী কোথায়?" নবকুমার উত্তর করিলেন, "মৃণ্ময়ি—মৃণ্ময়ি—মৃণ্ময়ি!"

ভ্রম-সংশোধন

পৃ.	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৮	marbel	marble
১৩	৩	পরিতোষং	পরিতোষঃ
৭৩	৩	পাইতেছি।	পাইতেছি।"